কিআ
কিশোর আলো

২টি গল্প • ৪টি কমিকস

ডিসেম্বর ২০২৪ । দাম ৫০ টাকা

তিন গোয়েন্দা
পান্না রহস্য

সব মামার সেরা
বিস্ক ক্লাব
মামা
ওয়েফার

প্রিয় বন্ধুরা,

শুভেচ্ছা নিও, আশা করি সবাই ভালো আছ। তোমাদের জন্য ওয়াণ্ডার কেক আবারও নিয়ে এলো '**ওয়াণ্ডারফুল ডে**' ক্যাম্পেইন। এই ক্যাম্পেইনে রয়েছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, ম্যাজিক শো ও বিভিন্ন ধরনের এক্সাইটিং গেমস। পাশাপাশি থাকবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, আকর্ষণীয় পুরস্কার ও ওয়াণ্ডার কেক তো থাকছেই।

তাই আর দেরি কেন? পুরোটা দিন স্মরণীয় করে রাখতে তোমরা রেডি তো?

অংশগ্রহণের নিয়মাবলি:

১। অংশগ্রহণের জন্য ওয়াণ্ডার কেককে ঘিরে তোমার আঁকা যেকোনো ছবি নিচে দেওয়া লিংক অনুযায়ী ফেসবুক পেজ অথবা গুগল ফর্মে তোমার নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা ও স্কুলের নামসহ তোমার অথবা অভিভাবকের আইডি থেকে শেয়ার করো।

২। তোমাদের পাঠানো ছবি থেকে আমরা সেরা ৫০০ জনকে নির্বাচিত করব।

৩। নির্বাচিত ৫০০ জন ওয়াণ্ডারফুল ডে ক্যাম্পেইনে অংশহণের জন্য বিবেচিত হবে। নির্বাচিতদের তথ্য আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

৪। ক্যাম্পেইনের দিনে থাকবে গ্র্যান্ড আর্ট কম্পিটিশন, ম্যাজিক শো ও বিভিন্ন ধরনের এক্সাইটিং গেমস।

৫। গ্র্যান্ড ফিনালে-তে বিজয়ীদের জন্য থাকবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, আকর্ষণীয় পুরস্কার ও ওয়াণ্ডার গিফট বক্স।

৬। ক্যাম্পেইন বিষয়ক সব তথ্য ওয়াণ্ডার কেক-এর ফেসবুক পেজে সরবরাহ করা হবে।

৭। যেকোনো প্রয়োজনে কল করো ০৮০০৭৭৭৭৭৭৭ (টোল ফ্রি) নম্বরে।

তোমার আঁকা ছবি শেয়ার করতে

নিচের QR কোড স্ক্যান করে লগ ইন করো ওয়াণ্ডার কেক-এর ফেসবুক পেজে অথবা গুগল ফর্মে

https://www.facebook.com/WonderCake.BD

https://shorturl.at/MwdX0

Facebook

Google

বিশেষ দ্রষ্টব্য: গ্র্যান্ড আর্ট কম্পিটিশনের সব উপকরণ ওয়াণ্ডার কেক কর্তৃক সরবরাহ করা হবে।

কিআ কিশোর আলো

ডিসেম্বর ২০২৪, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩১
পঞ্চাশ টাকা ● বর্ষ ১২ ● সংখ্যা ৩

ছোট্ট কৌতুক, বড় প্রশ্ন

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

ভেতর থেকে আওয়াজ এল, 'কে?'

বাইরে থেকে জবাব, 'আমি।'

'আমি কে?' ভেতর থেকে প্রশ্ন।

'আপনি কে তা আমি কী করে বলব?' বাইরে থেকে জবাব।

এটা কৌতুক। তবে এখানে একটা দার্শনিক কথা আছে, 'আমি কে?' সক্রেটিস বলতেন, 'নো দাইসেলফ। নিজেকে জানো।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করে, কে তুমি, উত্তর আসে না। বহু বছর পর দিনের শেষে সূর্য প্রশ্ন করে, কে তুমি। এর উত্তরও পাওয়া যায় না।

আমি কে, তা আমরা না জানতে পারি। কিন্তু আমরা কী হতে চাই, তা আমাদের জানা থাকা ভালো। আমরা ভালো মানুষ হতে চাই। আমরা কাউকে আঘাত দেব না। কারও ক্ষতি করব না। এমনকি প্রকৃতিরও ক্ষতি করব না। আমরা ভালোর চর্চা করব।

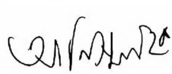

সম্পাদক : আনিসুল হক
সহকারী সম্পাদক : আদনান মুকিত
সহসম্পাদক : আহমাদ মুদ্দাসসের
শিল্পনির্দেশক : সৈয়দ লতিফ হোসাইন
গ্রাফিকস : মাহবুব রহমান, রনী হোসেন
ম্যাগাজিন সমন্বয়ক : শাহাদাত ফয়েজ ওয়াইসি
বিপণন ব্যবস্থাপনা : মো. মহিউদ্দিন রওনক
মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা : শামসুল হক

প্রচ্ছদ : আরাফাত করিম

প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ কর্তৃক মুদ্রিত।
যোগাযোগ : কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩। ওয়েবসাইট : www.kishoralo.com
ই-মেইল : editor@kishoralo.com
ফেসবুক : fb.com/kishor.alo। ইনস্টাগ্রাম : instagram.com/kishoralo
পরিবেশক : প্রথমা ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।

সূচিপত্র

আবার পড়ো

১০ | ছড়ায় এক ইতিহাস
শামসুর রাহমান

উপন্যাস

১৮ | তিন গোয়েন্দা
পান্না-রহস্য
কাহিনি রচনা : কাজী শাহনূর হোসেন
তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব

গল্প

৩২ | ভিনপাড়ার আগন্তুক
নাবিল মুহতাসিম

৩৮ | জাদু শিখুন
আরমান কবির

সালতামামি

৪২ | আলোচিত ২০২৪

উদ্ভাবন

৪৮ | দুনিয়া বদলানো ১২ উদ্ভাবন
আহমাদ মুদ্দাসসের

খেলতে পারো

৫৪ | ধনী হওয়ার মজার খেলা

জেনে রাখো

৫৬ | যা ভাবছ, তা তা না
জাহিন যাঈমাহ্ কবির

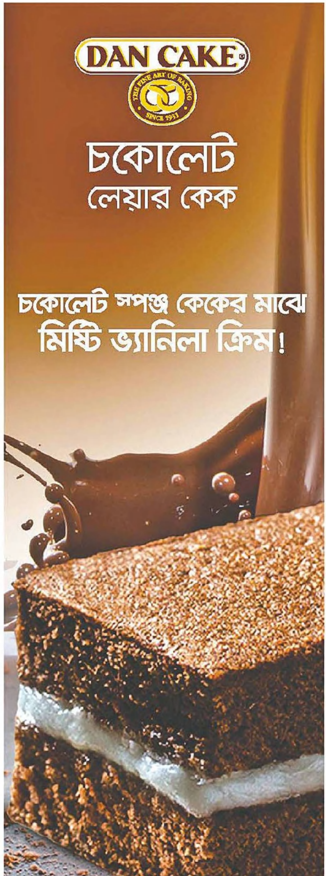

সূচিপত্র

প্রযুক্তি
৬০ | **যখন গাড়ি ব্রেক করে, তখন শক্তি কোথায় যায়**
জাকারিয়া সুমন

খেলা
৬৩ | **বিদায় লাল দুর্গের রাজা**
মৃণাল সাহা

অ্যানিমে-কথন
৬৬ | **অদেখা এক মায়ের খোঁজে**
প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

ধারাবাহিক কমিকস
৭০ | **জাদুশিলা রহস্য**
গল্প ও পেনসিল : মেহেদী হক
ইঙ্ক ও রং : ঐশিক জাওয়াদ
৭৪ | **অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু**
লেখা : আদনান মুকিত
আঁকা : সব্যসাচী চাকমা
৭৬ | **কেমন করে উড়তে হয় না**
ফাহিম আনজুম রুন্মান

কমিকস
৮৪ | **তাতা**
বাসব রায়

নিয়মিত বিভাগ
৬ | চিঠিপত্তর
১৩ | আমরা সবাই রাজা
৩৭ | আবিষ্কার
৫৮ | মজার তথ্য
৬১ | শব্দের খেলা
৮৬ | বুদ্ধির ব্যায়াম
৯০ | গণিতের ধাঁধা
৯২ | অরিগ্যামি
৯৩ | কুইজ

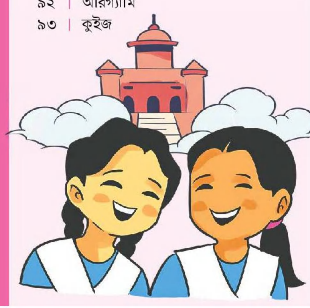

ওয়ান্ডার
মাফিন
কেক
চকলেটি
স্বাদে ভরপুর
ওয়ান্ডার
মাফিন
কেক
Muffin
Cake
20 PACK
Pack of Happiness.
বাইটে বাইটে
ওয়ান্ডার

প্রিয় কিআ,

আমি হলাম ই-মেইল। নভেম্বর সংখ্যায় দেখলাম, 'চিঠির খাম'-এর চিঠি ছাপিয়েছ। তা আমরাই-বা থেমে থাকব কেন? খাম তার চিঠিতে 'হতচ্ছাড়া'সহ ই-মেইলকে নিয়ে যেসব অবমাননাকর শব্দ ব্যবহার করেছে, 'বাংলাদেশ ই-মেইল সোসাইটির' পক্ষ থেকে আমি এর তীব্র নিন্দা জানাই। শিগগিরই খামের নামে মানহানির মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। তবে তুমিও ছাড় পাবে না। বাংলাদেশ ই-মেইল সোসাইটির পক্ষ থেকে তোমাকে ৩০ দিনের আলটিমেটাম দেওয়া হলো। এই ৩০ দিনের মধ্যে 'চিঠিপত্তর' বিভাগের নাম পরিবর্তন করে 'ই-মেইলপেপারস' করতে হবে। অথবা 'ই-মেইলপেপারস' নামে নতুন বিভাগ খুলতে হবে। অন্যথায় আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বাংলাদেশ ই-মেইল সোসাইটির এক সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আসলে কিআ, সত্যি বলতে কি, চিঠির খাম আমাদের থেকে একটু সিনিয়র বলে আমরা তাদের কিছুটা সম্মান করি। তাই বলে কি এসব কথা হজম হয়?

আতিক মাহমুদ
সপ্তম শ্রেণি, আফরোজ খান মডেল স্কুল, ময়মনসিংহ

কিআ : অত্যন্ত যৌক্তিক প্রতিবাদ। উত্তেজিত হয়ে 'হতচ্ছাড়া' শব্দটা ব্যবহার করায় ই-মেইল গোষ্ঠী খেপে গিয়েছে—এটা বুঝতে পারছি। তবে মামলা করার আগে খামের বিরুদ্ধে যে উকিল নোটিশ পাঠাবে, সেটা কিন্তু খামেই পাঠাতে হবে। ব্যাপারটা ভেবে দেখো। তা ছাড়া জাতীয় জীবনে যাবতীয় অনেক কিছু করার জন্যই খাম খুব গুরুত্বপূর্ণ। অতএব আমি বলি কি, ই-মেইল, খাম তোমরা মিলেমিশে থাকো। তাহলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। আর চিঠিপত্তরের নাম বদলানোর কোনো দরকার নেই। মনে রাখবে, খাম আর ই-মেইল বাইরে কেবল, ভেতরে সবারই সমান চিঠি।

প্রিয় কিআ,

তোমাকে ভালোবাসি, তবে তোমাকে ঠিক কতটা ভালোবাসি, তা জানি না। আসলে ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম সেপ্টেম্বর ২০১৬-তে। প্রথম দেখাতেই তোমার প্রেমে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। তুমি হলে আমার একাকিত্বের সাথি, আমার আবেগ, স্মৃতি। দীর্ঘ চার বছর মা-বাবাকে ছাড়া হোস্টেলে বেড়ে উঠেছি, সে সময় তুমি আমাকে মা-বাবা ছেড়ে দূরে থাকার কষ্ট বুঝতে দাওনি। তুমি আমাকে যতটা ভালোবেসেছিলে, আমি হয়তো তোমাকে ততটা ভালোবাসতে পারিনি। তা না হলে হোস্টেলজীবন পার করার পর তোমাকে ভুলে যেতাম না। যদি সম্ভব হয়, আমাকে ক্ষমা করো। আবার দীর্ঘ দুই বছর পর যখন তোমাকে দেখলাম, তখন আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। তাই তোমার সামনে আমার ব্যথিত হৃদয় প্রকাশের চেষ্টা করলাম। তোমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা (বিলম্বে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত)। তোমার কাছে আবদার করার অধিকার আমি হারিয়েছি, তাই তোমার কাছে দুটো অনুরোধ রইল—নিয়মিত বিভাগ 'নিজেকে জানো' কি আবার চালু করা যায়? আর আদনান মুকিত ভাইয়ের 'দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি'র পার্ট দুই কি প্রকাশ করা সম্ভব হবে?

সিয়াম খান
দ্বাদশ শ্রেণি, ডি এস কে এম ডেমরা, ঢাকা

কিআ : ভুলে গিয়ে ভালোই করেছ। না হলে তো খুঁজে পাওয়ার আনন্দটা পেতে না (তাই বলে আবার ভুলে যেয়ো না)। 'নিজেকে জানো' আবার চালু করার চেষ্টা করছি আমরা। আর 'দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি'র দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে এখনই কিছু বলতে পারছি না। লেখককে ভালোমতো চেপে ধরতে হবে। তার আগে তোমরা আরও মজার একটা ধারাবাহিক পাবে নতুন বছরে—এটা নিশ্চিত। ভালো থেকো।

প্রিয় কিআ,

আমি ভালো নেই। কেন জানো? আমার বেস্ট, ক্লোজ যা-ই বলো, সেই বন্ধু তানভীর স্কুল ছেড়ে চলে গেছে। প্রথম প্রথম খুব একটা কষ্ট লাগত না আমার। কিন্তু এখন কষ্টটা অনুভব করতে পারছি। অনেকে হয়তো ভাবতে পারে যে স্কুল ছেড়ে গেলে সমস্যা কী? এলাকায় দেখা হবে। না, আমার সঙ্গে সেটাও হলো না। বরং ও এলাকা ছেড়ে, স্কুল ছেড়ে, এমনকি আমাকে ছেড়েও চলে গেল শেরপুরে। এখন বুঝতে পারছি, একাকিত্ব একটা মানুষকে কতটা কষ্ট দেয়। এবার হয়তো আমার সঙ্গে কেউ গান শুনবে না, হয়তো কেউ আমার সঙ্গে ঘুরবে না, হয়তো আমার কাছ থেকে কেউ তোমাকে নিয়ে পড়বে না!

সামিন তাহসীন
অষ্টম শ্রেণি, ক্যালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ময়মনসিংহ

কিআ : শহর কিংবা স্কুল ছেড়ে বন্ধু চলে যাচ্ছে—এই অনুভূতি খুবই কষ্টের। তোমার কষ্ট পাওয়াই স্বাভাবিক। তবে আশার কথা এই যে ময়মনসিংহ থেকে শেরপুর খুব একটা দূরে নয়। মাঝেমধ্যেই তোমরা দেখা করতে পারবে। শেরপুরে খুব সুন্দর জঙ্গল আছে। তানভীর যখন জায়গাগুলো চিনে ফেলবে, তখন তোমরা ঘুরেও বেড়াতে পারবে। বন্ধুত্বের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো, এটা কোনো দূরত্ব মানে না। ৬৮ কিলোমিটার তো কোনো দূরত্বই নয়। তোমাদের বন্ধুত্ব দীর্ঘায়িত হোক। শুভকামনা দুজনের জন্য।

প্রিয় কিআ,

তুমি জেনে খুশি হবে যে আমি ক্যাডেট পরীক্ষায় ভালো ফল করেছি। আমার সাধারণ জ্ঞান নিয়ে খুব চিন্তা ছিল। সাধারণ জ্ঞান প্রশ্ন পেয়ে দেখি, সব প্রশ্ন আমার কমন পড়েছে। যার কারণ হলে তুমি। তোমার লেখা 'অলিম্পিকের নানা রূপ', 'মেয়েরাই বারবার জিতিয়ে দেয় বাংলাদেশকে'

লেখাগুলো পড়ে আমি যে কী উপকৃত হয়েছি, তা তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। গল্পগুলো পড়ে ক্যাডেটে আমার সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষা ভালো হয়েছে। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার মতে, তুমি হলে একধরনের সালতামামি। ভালো থেকো।

ক্যাডেট খালেদ বিন সাইদ

কিআ : যাক, আজকাল প্রায়ই পরীক্ষায় কাজে আসছি। পাঠ্যপুস্তক হয়ে যাচ্ছি নাকি দিন দিন? তোমাদের চিঠিতে অনুপ্রাণিত হয়ে এ সংখ্যায় এমন বেশ কিছু লেখা আছে, যেগুলো তোমাদের সাধারণ জ্ঞান পরীক্ষায় কাজে লাগবে। আর ছোটখাটো একটা সালতামামিও দিয়ে দিলাম। কেমন লাগল জানিয়ো।

প্রিয় কিআ,

তোমার মতো একটা বড়লোক ম্যাগাজিনের তো ভালো থাকারই কথা। তাই বললাম না যে তুমি কেমন আছ। তবে আমি একদমই ভালো নেই। পড়াশোনার চাপ আমায় চাবকাচ্ছে। অন্যদিকে তোমার অমন কাণ্ড দেখে কী আর বলি! তুমি ভালো থাকার একটা ওষুধকে নিঃশেষ করে দিয়েছ। *দ্য নিউ অ্যাডভেঞ্চার অব ফার্মের মুরগি* উপন্যাসটা কি শেষ হওয়া খুব দরকার ছিল? সে যাকগে, এখন কয়েকটা আবদারের কথা শোনো :

১. নতুন বছর একটা নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস চাই আর তা হতে হবে আদনান মুকিত কর্তৃক লিখিত।
২. এআই আর্ট দেওয়া বন্ধ করো। কেমন যেন অপার্থিব আর প্রাণহীন লাগে।
৩. প্লিজ প্রোগ্রামিং নিয়ে ফিচার ছাপানোর চেষ্টা করো।

আর হ্যাঁ, বেশি মোটা হতে যেয়ো না, এই ফিটনেসই ঠিক আছে। ম্যাগাজিন তো কখনো মোটা মোটা হিসাববিজ্ঞানের বই হতে পারে না। তাই না?

নুসরাত জাহান
সপ্তম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম

কিআ : বাপ রে! এটা কি অনুরোধ না হুমকি, বুঝতে পারছি না। উত্তরগুলো দিচ্ছি

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

নতুন বছরে নতুন ধারাবাহিক উপন্যাস আছে। আদনান মুকিত তো মাত্রই লিখলেন, এখনই আবার লিখলে একঘেয়ে লাগতে পারে। আর লেখকও লম্বা উপন্যাস লিখে এখন কাহিল। নতুন উপন্যাস আসছে।

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

এআই আর্ট তো অনেকের কাছে ভালো লাগছে। কী করা যায় বলো দেখি?

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

প্রোগ্রামিং নিয়ে ফিচার হবে। আগামী বছর।

প্রিয় কিআ,

তোমার 'খেলা' বিভাগটা খুব ভালো লাগে আমার। তুমি কি আমার একটি অনুরোধ রাখতে পারবে? আমি একজন কারাতে খেলোয়াড়, আমি চাই, তুমি কারাতে সম্পর্কে কিছু ছাপাও। তাহলে আমার মতো অনেক কারাতে খেলোয়াড়কে উৎসাহিত করবে। আমি মনে করি, প্রত্যেক মানুষের এই খেলায় অংশ নেওয়া উচিত। মানুষের শরীর ও মন উভয়ই ভালো রাখবে এই খেলা। তুমি ছাপাবে তো? ভালো থেকো তুমি।

মো. আজমাইন ফিদা
সপ্তম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

তোমার চিঠি ও লেখা পাঠাও এই ঠিকানায়

চিঠিপত্তর, কিশোর আলো
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।
ই-মেইল : editor@kishoralo.com
ফেসবুক : fb.com/kishor.alo
ওয়েবসাইট : www.kishoralo.com

কিআ : তুমি ঠিকই বলেছ। সবারই কারাতে শেখা দরকার। অবশ্যই আমরা কারাতে নিয়ে লেখা ছাপব। খুব ভালো একটা আইডিয়া দিয়েছ। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।

প্রিয় কিআ,

আজ ২১ নভেম্বর তোমায় চিঠি লিখছি, কিন্তু এ মাসের সংখ্যা এখনো হাতে পাইনি। তোমার মনে হতে পারে, মা-বাবা হয়তো পরীক্ষার জন্য কিনে দিচ্ছেন না। কিন্তু ঘটনাটা অন্য রকম। আসলে হকার আঙ্কেল প্রতি মাসে ঠিক সময়মতোই কিআ দিয়ে যান। কিন্তু এ মাসে তিনি আসার সময় হঠাৎ গলির মুখে একদল কুকুর ছুটে আসে। সাইকেল সামলাতে না পেরে আঙ্কেল সাইকেলসহ রাস্তার পাশে ড্রেনে পড়ে যান। এদিকে তোমারও হলো জলাঞ্জলি, না না। ড্রেনাঞ্জলি। হি হি... তবে চিন্তা নেই। গতকাল প্রথমা থেকে তোমায় অর্ডার করেছি। লেখা এখানেই শেষ করলাম।

স্নিগ্ধেন্দু মন্ডল
ষষ্ঠ শ্রেণি, সরকারি দৌলতপুর মুহসিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা

কিআ : আহ হা! আঙ্কেল বেচারা ব্যথা পেয়েছেন কি না, খোঁজ নিয়ো। আশা করি এবার ঠিক সময়মতো কিআ পেয়েছ। কুকুরগুলোকে খাবার দিয়ো। ওরা হয়তো খাবার পায়নি বা অন্য কোনো কারণে রেগে ছিল। এখন তো ঠান্ডার সময়। খেয়াল রেখো ওরা ঠান্ডায় কষ্ট পাচ্ছে কি না। ভালো থেকো।

প্রিয় কিআ,
আশা করি তুমি ভালো আছ। আজ তোমাকে প্রথম চিঠি লিখছি, তা-ও আবার ক্লাসে বসে। ভেবো না যে স্যারের কাজ না করে তোমাকে চিঠি লিখছি। আসলে স্যার বসে অন্য কাজ করছেন, পড়াচ্ছেন না। তাই তোমাকে লিখছি। তোমার নভেম্বর সংখ্যাটা দারুণ হয়েছে। বিশেষ করে যারা ক্রাফট করতে পছন্দ করে, তাদের জন্য এই সংখ্যা অবশ্যই বিশেষ কিছু। আমিও ক্রাফট করতে ভালোবাসি, তবে এখন অত বেশি করা হয় না। আজ তোমাকে প্রথম চিঠি লিখছি, তাই আমার কোনো আবদার নেই। তবে তোমার বিচিত্র ও বিনোদন বিভাগটা আমার খুব ভালো লাগে। প্রতিটি সংখ্যায় বিভাগ দুটি রাখার চেষ্টা কোরো।
হুমায়রা রশীদ
সপ্তম শ্রেণি, কুড়িগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কুড়িগ্রাম

কিআ : এই চিঠি স্যারের নজরে যেন না পড়ে, সেই চেষ্টা কোরো। স্যার আবার খেপে গেলে কিন্তু বিপদ। ক্রাফট নিয়ে সংখ্যাটা নিয়ে আমরা একটু দ্বিধায় ছিলাম যে তোমাদের ভালো লাগবে কি না। ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। ধন্যবাদ তোমাকে। ভালো থেকো।

প্রিয় কিআ,
জানো! গত মাসে আমার কাজিন আমাকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। তোমাকে আমার অনেক পছন্দ হয়েছে। তোমাকে চিনে আমি গর্বিত। আমার কাজিন রাতুলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়াতে। ওখানেই আমি বসবাস করি। মে মাসে বাংলাদেশে ঘুরতে এসেছি নানা-নানুর কাছে। আগামী মাসে আবার চলে যাব। তাই ভাবলাম নতুন পাঠক হিসেবে তোমাকে একটা চিঠি দিয়েই যাই। আমি বাংলা স্পষ্টভাবে বলতে বা পড়তে শিখলেও স্পষ্টভাবে লিখতে শিখিনি। তাই রাতুলকে দিয়ে লিখিয়েছি। চলে যাব বলে ভেবো না আমি তোমাকে পড়ব না। অবশ্যই পড়ব। আমি বাবাকে দিয়ে পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে কিআর ১৩টি পুরোনো সংখ্যা আনিয়েছি নিয়ে যাব বলে। আমার জন্য দোয়া করবে প্লিজ।
সরওয়ার হোসাইন

কিআ : দারুণ ব্যাপার! তোমার সৌজন্যে তো আমেরিকা ভ্রমণ করে ফেলবে কিআ। এই লেখা তোমার কাছে পৌঁছাবে কি না, জানি না। রাতুল নিশ্চয়ই তোমাকে জানাবে। তুমি কিন্তু আমেরিকা থেকেই কিশোর আলো পড়তে পারবে। কিশোর আলো ই-ম্যাগাজিন পুরো বিশ্ব থেকেই পড়া যায়। তুমি সাবস্ক্রাইব করলেই পড়তে পারবে যেকোনো ডিভাইসে। আরেকটা ব্যাপার, যেহেতু বাংলা লিখতে কষ্ট হয় তোমার, তুমি ক্যালিফোর্নিয়া থেকেই ই-মেইল করতে পারো। তবে তুমি কিন্তু এ যুগের কিশোর পাশা। কিশোরও কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়াতেই থাকে, রকি বিচে। তোমার সঙ্গে দেখা হলে বোলো বাংলাদেশে এসে ঘুরে যেতে। তুমিও আবার এসো। রাতুলকে অনেক ধন্যবাদ তোমার হয়ে চিঠি লিখে দেওয়ার জন্য। দুজনের জন্যই শুভকামনা।

প্রিয় কিআ,
অনেক অভিমানের পরও তোমার কাছে চিঠি লিখছি। টানা দুবার আমি চিঠি পাঠালেও তুমি জবাব দাওনি। এবারের চিঠিটা আমি অনেক আশা নিয়ে লিখছি, আমি চেয়েছিলাম নতুন ভক্ত হিসেবে আমার নাম স্মরণীয় করে রাখতে। তা আর সম্ভব হয়নি। আমি জানি যে আমার লেখা ভালো না, অনেক অগোছালো। কিন্তু তারপরও চিঠি লিখছি। আমার ক্রিকেট খেলতে অনেক ভালো লাগে। তোমার কাছে আমার অনুরোধ, ক্রিকেট বিষয়ে একটি সংখ্যা তৈরি করো। আর আমি কুইজের উত্তর প্রতিবারের মতো এবারও পাঠিয়েছি। তুমি চাইলে আমাকে পুরস্কার দিতে পারো।

আজ আর নয়। আশা করি আমার অনুরোধগুলো রাখবে।
তাহসিন মাহফুজ
সপ্তম শ্রেণি, নাটোর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর

কিআ : ক্রিকেট নিয়ে আমরা আগেও সংখ্যা করেছি। আবার করব ২০২৬ সালে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সময়। তার আগপর্যন্ত নিয়মিত ক্রিকেট নিয়ে লেখা তো প্রতি সংখ্যাতেই থাকবে। আশা করি লেখাগুলো ভালো লাগবে তোমার। তুমি কী ধরনের লেখা চাও, জানিয়ে রাখতে পারো। আমরা সেগুলো ছাপাতে চেষ্টা করব।

প্রিয় কিআ,
আমি তোমাকে অনেক দিন থেকেই ‘কেমন করে উড়তে হয় না’ কমিকসটির সংস্কার নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু কিছুতেই আর হয়ে উঠছিল না, আজ যেহেতু সুযোগ পেয়েছি, তাই বলি, কোথায় কোথায় সংস্কার করতে হবে। আমার প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করছি—

১. কমিকসের চরিত্রগুলোর সংলাপ অনেক কম। যার কারণে গল্পটি কেমন বা কোন দিকে যাচ্ছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় (আমার কাছে মনে হয়েছে)।
২. কমিকসটির ছবিগুলো দারুণ হলেও বহুপৃষ্ঠাবিশিষ্ট (আমাদের ছিমছাম কিআর জন্য যা মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়)।

[বি. দ্র. এই মাসের কিশোর আলোর শেষ পাতায় কুইজ বিজয়ীদের মধ্যে আমার এক পুরোনো বান্ধবীর নাম দেখেছি। আমার পক্ষ থেকে ‘আতিয়া আজিজাহ্’কে অভিনন্দন জানিয়ে দিয়ো কিন্তু!
আফিয়া রাইসা
ষষ্ঠ শ্রেণি, সৃষ্টি একাডেমিক স্কুল, টাঙ্গাইল

কিআ : তোমার পর্যবেক্ষণ দারুণ। সারা বিশ্বেই নানা ধরনের কমিকসের চর্চা হয়। এমনকি সংলাপহীন কমিকসও দারুণ জনপ্রিয়। একেকটা কমিকসের ধরন একেক রকম। ‘কেমন করে উড়তে হয় না’ কমিকসটা ধরনই এ রকম। সংলাপ, গল্প, আইডিয়া, আঁকা সবকিছু মিলিয়ে কমিকসটা বিবেচনা করতে হবে। আর তোমার বান্ধবী আতিয়াকে অনেক অভিনন্দন। তোমাকেও ধন্যবাদ। আবার চিঠি দিয়ো।

অলংকরণ : **নাইমুর রহমান**

Digital Campaign 2024
Season-21
WALTON
Smart Fridge
ডাবল মিলিয়ন অফার
ওয়ালটন পণ্য কিনে পেতে পারেন
২০ লক্ষ টাকা
রয়েছে কোটি কোটি টাকার নিশ্চিত উপহার
শর্ত প্রযোজ্য
অফারটি চলবে ১০ অক্টোবর থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত
মেসার্স সজু এন্টারপ্রাইজ, গাংনী বাজার, মেহেরপুর থেকে
ফ্রিজ কিনে পেলেন
২০ লক্ষ টাকা
জনাব মোঃ রাশেদ আলী, পিতা: মোঃ রফিকুল ইসলাম
বাথানপাড়া, রাইপুর, গাংনী, মেহেরপুর
ওয়ালটন প্লাজা, গণেশতলা, দিনাজপুর থেকে
ফ্রিজ কিনে পেলেন
২০ লক্ষ টাকা
জনাব মোঃ রানা ইসলাম, পিতা: মোঃ নজরুল ইসলাম
লালবাগ, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর
ফ্রিজ কিনে পেলেন
১ লক্ষ টাকা
জনাব সাদেক আলী, পিতা: মোঃ আবুল হাসেম
বিনাউটি, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ওয়ালটন প্লাজা, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর থেকে
ফ্রিজ কিনে পেলেন
১ লক্ষ টাকা
জনাব মোঃ ইকবাল হোসেন, পিতা: নুরুল ইসলাম
মালাপাড়া, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর
ওয়ালটন প্লাজা, ময়মনসিংহ থেকে
ফ্রিজ কিনে পেলেন
১ লক্ষ টাকা
রুমা ইলেকট্রনিক্স, পল্লবী, মিরপুর-১১, ঢাকা থেকে
ফ্রিজ কিনে পেলেন
১ লক্ষ টাকা
জনাবা তাছলিমা আক্তার, পিতা: মোঃ নুরুল আমিন
দুয়ারিপাড়া, পল্লবী, মিরপুর-১১, ঢাকা
IOT SMART REFRIGERATOR
METAL & DUO COOLING+
MSO PLUS INVERTER
AI DOCTOR ADVANCED CARING 24/7
For Details: 16267
08000016267 (Toll Free)
waltonbd.com
শর্তাবলি জানতে QR Code স্ক্যান করুন অথবা ভিজিট করুন: waltonbd.com/digital-campaign-season-21

ছড়ায় এক ইতিহাস

শামসুর রাহমান

বাস্ রে সে কী একাত্তরে
ফুলবাগানে, খেলাঘরে,
গলির মোড়ে, নদীতীরে,
ফ্ল্যাটে এবং খড়-কুটিরে,
খেতের আলে, ছাঁদনাতলায়,
বাংলাদেশের বুকে গলায়
রাত-দুপুরে অন্ধকারে
খটখটা খট পড়ল হাড়ে
জেনারেলের বুট।

হাজার হাজার সৈন্য এসে
দাগল কামান বাংলাদেশে
মেশিনগানের চ্যাঁচানিতে
পারে না কেউ নিদ্রা দিতে।
মরল মানুষ মাছির মতো
দিনরাত্তির অবিরত,
মরল মানুষ পথে ঘাটে,
বন্ধ ঘরে, খোলা মাঠে—
নয়কো মোটে ঝুট।

দানোর ভয়ে দলে দলে
গ্রাম্য বধূ লুকায় জলে।
খেলা ভুলে শিশুরা হায়
মায়ের বুকে শুধু লুকায়।
শহর শহর সব শহরে
গেরস্তদের পোড়া ঘরে,
হাট-বাজারে গঞ্জ-গ্রামে
দিন-দুপুরে খোদার নামে
চলল হরির লুট।

হাজার হাজার মুক্তিসেনা,
কেউ-বা চেনা, কেউ অচেনা—
পড়ল ছেয়ে সারাদেশে
রকমারি ছদ্মবেশে।
রইল মিশে খালের পাশে,
গাছের পাতায় ঘাসে ঘাসে।
তাদের দেখে শত্রু যত
ভয়-পাওয়া সব হুলোর মতো
দিল বেজায় ছুট।

শামসুর রাহমান (২৩ অক্টোবর ১৯২৯—১৭ আগস্ট ২০০৬) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। পেশায় সাংবাদিক ছিলেন। *দৈনিক বাংলা* ও *বিচিত্রা* সম্পাদনা করেছেন। *রূপালি স্নান*, *রৌদ্র করোটিতে*, এবং *বন্দী শিবির থেকে* তাঁর বিখ্যাত কবিতার বই। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর কবিতা প্রেরণা জুগিয়েছে। পেয়েছেন একুশে পদক, স্বাধীনতা পদকসহ বহু পুরস্কার। 'ছড়ায় এক ইতিহাস' ছড়াটি নেওয়া হয়েছে *লাল ফুলকির ছড়া* (১৯৯৫) থেকে।

অলংকরণ : **রেহনুমা প্রসূন**

বাংলাদেশের
Gen Z
বিশ্বাস করে
সব সম্ভব

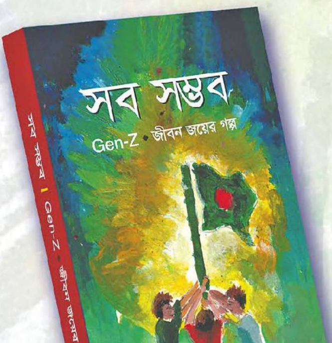

**শত তরুণের
জীবন জয়ের গল্প**

মূল্য ~~৫০০~~ টাকা
২৫০ টাকা
(সীমিত সময়ের জন্যে)

ফ্রি ডাউনলোড

অনলাইনে ফ্রি পড়ুন

পরিচিতদের সাথে শেয়ার করুন

quantummethod.org.bd

সিটি ব্যাংক পিএলসি

সিটি ব্যাংক সেন্টার
২৮ গুলশান অ্যাভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা
www.citybankplc.com
কল সেন্টার : ১৬২৩৪

সিটি ব্যাংক™

মেকিং সেন্স অব মানি

দেশের অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁক ঘুরছে সিটি ব্যাংক

সিটি এসএমই ছুঁয়েছে ৯,০০০ কোটি টাকার লোন পোর্টফোলিও। ৩৫,০০০ ছোট ব্যবসায় জামানতবিহীন ৪,০০০ কোটি টাকার লোন, যার ২৩ শতাংশই নারী উদ্যোক্তাদেরকে দেওয়া; আর মাঝারি ব্যবসায়ের ২,৩০০ ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাকে দেওয়া ৫,০০০ কোটি টাকা — কোনো সন্দেহ নেই সিটি ব্যাংক বাঁক ঘুরছে দেশের অগ্রযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়েই।

আমাদের ১৭৫টি শাখা-উপশাখা, ৩৪টি এসএমই ইউনিট ও ৫০০-র বেশি এজেন্ট ব্যাংক আউটলেট প্রস্তুত এই বাঁক বদলকে এগিয়ে নিতে। কারণ, আমরা জানি, এসএমই-র এগিয়ে যাওয়া মানেই দেশের এগোনো।

আমরা সবাই রাজা

ঘুমের দেশে একদিন

ঘুমের দেশে সবাই রাজা,
নেই তো কোনো প্রজা।
সবার মনেই সুখ-শান্তি,
নেই তো কোনো মজা।

সবকিছুই তো ঘুমের মধ্যে,
ঘুম ভাঙলেই শেষ।
তাই ঘুমের দেশে সন্ধে হলে,
রাজবাড়ি হয় দেশ।

রাজবাড়ি তো ভালো কথা,
দেশ যেন না হয় শেষ।

জান্নাতুল নাভিয়া

শেষ না হওয়া বন্ধুত্ব

করোনা মহামারির প্রকোপ ধীরে ধীরে কমার পর যখন পুরোদমে স্কুল খুলল, তখন থেকেই তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বটা শুরু হয়েছিল। তখন আমরা ক্লাস এইটে পড়তাম। যদিও দুজন ছিলাম দুই শাখায়। কিন্তু কখনো আমরা একে অপরকে ছেড়ে যাইনি। এরপর নাইনে ওঠার পর আমাদের শাখা একই হলো। তখন প্রতিদিন একজন আরেকজনের জন্য জায়গা ধরা, ক্লাসে স্যারের চোখ ফাঁকি দিয়ে খাওয়া, স্যারদের ছদ্মনাম দেওয়াসহ অনেক মজা করতাম। সবচেয়ে রাগী স্যারদের ক্লাসেও আমাদের দুষ্টুমি সব সময় থাকত। যেটা ছিল আমাদের জন্য অনেকটা দুঃসাহসিক অভিযানের মতো। এভাবেই নবম-দশম শ্রেণি কেটে গেল। কিন্তু আমাদের স্মৃতিগুলো থেকে যাবে আজীবন। স্কুলের বেঞ্চে আমাদের খোদাই করা নামটাও থেকে যাবে। শুধু একসঙ্গে থাকব না আমরা। কিন্তু তোকে আমি আজীবন মনে রাখব। তুই ছিলি আমার বোনের সমতুল্য। আমি চাই, আমাদের মতো স্কুলটাও যেন তার প্রতিটি গাঁথুনিতে আমাদের মনে রাখুক। যেমনটা আমরা একে অপরকে মনে রাখব।

নাজিবাহ্ জাহান
এসএসসি পরিক্ষার্থী, সন্দ্বীপ আনন্দ পাঠশালা, চট্টগ্রাম

ভয়

আমরা তখন ছিলাম আমার ছোট ফুফির বাসায়। শীতকাল ছিল, রাত বারোটা বা একটা বাজছিল। তখন আমার ফুফাতো বোন, ফুফাতো ভাইসহ সবাই একটা অন্ধকার ঘরে ঢুকে ভূত এফএম চালু করি। একটা-একটা করে কাহিনি শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আমার তখন বাথরুম চেপেছিল। আমি বাইরে যাওয়ার সময় আমার ভাইকে সঙ্গে আসতে বলেছিলাম। কিন্তু সে আমাকে বলল, 'ভীতু! তুই কি ভয় পাস?' আমি ওকে বলি, 'না, আমি ভয় পাই না।'

তারপর আমি বাইরে গিয়ে বাথরুমে গেলাম। বাথরুমটা কাছেই ছিল, একটু ভাঙা। আমি অনেক ভয় পেয়ে গেলাম। বাথরুম থেকে বের হওয়ার পর আমি সাদা কী যেন একটা দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে একদৌড় দিলাম ভয়ে। পেছনে কিছু ছিল কি না, তা ভালো করে খেয়ালও করিনি। ঘরে ঢোকার পর কাউকে কিছু বলিনি। ভয় পেয়েছি খুব। তারপর রাত তিনটা-চারটার মতো বাজছিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আমার আর ঘুম আসছিল না। আমি গড়াতে গড়াতে চোখ খুলে দেখি, আরেকটা সাদা জিনিস টেবিলের ওপর বসে আছে। আমি ভয়ে চুপচাপ চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। তারপর একসময় আমার ঘুম এল, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালবেলা উঠে আমি টেবিলের ওপর একটা সাদা কাপড় দেখতে পাই। তখন আমি মনে মনে বললাম, আমি কি এতটাই বোকা যে একটা কাপড়কে ভূত মনে করলাম? তারপর ব্রাশ করে বাইরে বাথরুমের কাছে গিয়ে দেখি, ওখানে আরেকটা সাদা কাপড় মেলা ছিল।

আহনাফ
সপ্তম শ্রেণি, এবিএম গ্রাজুয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

স্বপ্নের সন্ধানে

দিনগুলো কেমন যেন অদ্ভুতভাবে শুরু হয়েছে। চারপাশে হাসি আর কোলাহল অথচ আমি এই পথে একা—চারপাশে ভিড় কিন্তু মনে হচ্ছে আমি একেক কণা। সবার স্বপ্নের লক্ষ্যে চলা দেখে ভাবি, আমি কোথায়? তারা যখন পদে পদে সফলতার গল্প বলছে, তখন আমি নিজের মধ্যে ডুবে আছি। আমার ভেতরেও একটি সৃষ্টির আগুন জ্বলছে। কী হতে চাই আমি? শিল্পী? লেখক? সবকিছু চুপচাপ অবকাশ নেয় মনের গহিনে। কারও কাছে প্রকাশ করতে পারি না। সংগীতের সুরে বলতে ইচ্ছা করে কিন্তু গলা যেন আবার শক্ত হয়ে যায়। কখনো রাতের নিস্তব্ধতায় মুছে ফেলি সব দুঃখ-কষ্ট। আমি স্বপ্ন দেখি, রংবেরঙের ছবিতে ডুব দিয়েছি। কী অদ্ভুত, তখনই যেন মনে হয়, জীবনটা কেবল একটা বিশাল ক্যানভাস, যেখানে আমি সব বিষয়ে রং ফোটাতে পারি। কিন্তু সকালে উঠে যখন দেখি বাস্তবতার সেই একই টানাপোড়েন। পরীক্ষা, বাড়ির কাজ—সবকিছু যেন এক ভারী বোঝা। এত বিধিনিষেধের মধ্যে আমি পড়ে যাচ্ছি। জানি, এই অন্ধকারে কিছু আশার আলো লুকিয়ে আছে। হয়তো জীবন আমাদের পরীক্ষায় ফেলে শুধু দেখার জন্য যে আমরা সত্যিই কী? আমার ভেতর সৃজনশীলতার যে চাহিদা, তা হয়তো কিছুদিন পর ঠোঁটের কোণে হাসি ফোটানোর জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে মনে রাখতে হবে, আমি যেন নিজের খোঁজেই হারিয়ে না যাই। যতই অন্ধকার থাকুক, সূর্য রয়েছে, আমি তার জন্য প্রস্তুত। বিশ্বাস রাখতে হবে, কাল সকালে নতুন সূর্য উঠবে, আমি সেই আলোয় দাঁড়িয়ে উপভোগ করব নিজের প্রতিটি সৃষ্টি। হয়তো আমার স্বপ্নগুলো একদিন বাস্তবে পরিণত হবে। আরও একবার ভাবো! সব বাধা, সব অন্ধকার—এসব একদিন আমাকে শক্তিশালী করে তুলবে। হয়তো আমি আজ ভেঙে পড়ব কিন্তু স্মৃতির ভেতর হালকা একটি চিহ্ন রেখে যাব। আমি হারতে পারব না; আমি জিতব!

মালিহা
অষ্টম শ্রেণি, ক্যামব্রিয়ান স্কুল, ফেনী

করিডরে কে

প্রায় ছয় বছর হলো আমি এই স্কুলে পড়ালেখা করছি। খুব সুন্দর আমার স্কুল, আশপাশে ঘন পাহাড়, পাহাড়ে সবুজ বৃক্ষরাজি, তাতে নানা রঙের ফুল, ফুলে ফুলে পাখি আর মধুর খোঁজে ভ্রমর। তবে এই সুন্দর জায়গা নিয়ে আমার জীবনে দুঃস্বপ্নময় একটি স্মৃতি রয়েছে।

আমার স্কুলের পুরোনো ভবনটি পাঁচতলা। চারতলা পর্যন্ত ক্লাস হয়, পাঁচতলায় সাধারণত ক্লাস হয় না। শুধু পরীক্ষার সময় ক্লাসরুমগুলো খোলা হয়। ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগত আমার কাছে। প্রথম যখন স্কুলে ভর্তি হই, তখন আমার বান্ধবীরা নানা রকম ভূতের গল্প বলত পাঁচতলার করিডরটা নিয়ে। আমি অবশ্য খুব একটা পাত্তা দিতাম না। তবে আমার বেশ ভয় লাগত। আবার অবাকও লাগত যে চারতলা পর্যন্ত এত হইহুল্লোড়, পাঁচতলা নীরব আর সুনসান। অলসতার কারণে ওদিকে খুব একটা পা মাড়াতাম না আমি (তবে বান্ধবীদের সঙ্গে লোভে পড়ে যেতাম মাঝেমধ্যে) এখন আর সেদিকে যাই-ই না।

ক্লাস সিক্সে ক্লাস পার্টির সময় আমি ও আমার কিছু বন্ধু ক্লাস সাজানোর দায়িত্ব পেয়েছিলাম। এটা নিয়ে খুশি আর উৎসাহের শেষ ছিল না আমার। ক্লাসে গিয়ে বেশ হইহই করে কাজে লেগে পড়লাম। বেশ কিছুক্ষণ পর কিছুটা দুর্বল বোধ করলাম। ভাবলাম তিনতলার ওয়াশরুমে

ডুবে গেল

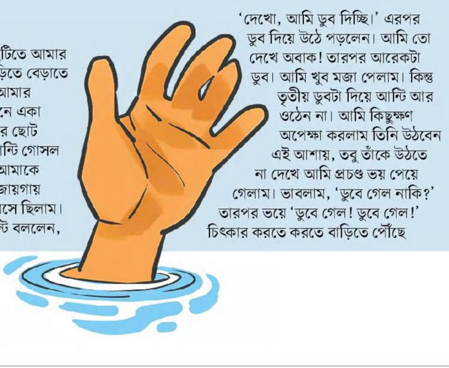

তখন আমি খুব ছোট ছিলাম। ছুটিতে আমার খালা ও আন্টিদের সঙ্গে নানুবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। নানুবাড়ির পুকুর আমার খুব প্রিয় ছিল, কিন্তু আম্মু সেখানে একা যেতে দিতেন না। একবার আমার ছোট আন্টির সঙ্গে পুকুরে গেলাম। আন্টি গোসল করার জন্য পানিতে নামলেন। আমাকে বললেন, পুকুরের পাড়ে বসার জায়গায় বসে থাকতে। আমি সেখানেই বসে ছিলাম। গোসল করতে করতে ছোট আন্টি বললেন, 'দেখো, আমি ডুব দিচ্ছি।' এরপর ডুব দিয়ে উঠে পড়লেন। আমি তো দেখে অবাক! তারপর আরেকটা ডুব। আমি খুব মজা পেলাম। কিন্তু তৃতীয় ডুবটা দিয়ে আন্টি আর ওঠেন না। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম তিনি উঠবেন এই আশায়, তবু তাঁকে উঠতে না দেখে আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, 'ডুবে গেল নাকি?' তারপর ভয়ে 'ডুবে গেল! ডুবে গেল!' চিৎকার করতে করতে বাড়িতে পৌঁছে

গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে আসি। আমাদের স্কুলে মেয়েদের এই ওয়াশরুমে মাঝেমধ্যে পানি থাকে না। তখন চারতলার ওয়াশরুমটায় যেতে হয়। আমি মনে মনে দোয়া করলাম, যেন আজ অন্তত পানি থাকে। আমি অতটুকু কষ্টও করতে চাইনি, আর তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, পুরো স্কুল প্রায় খালি। আমি পাঁচতলার কাছাকাছিও যেতে চাচ্ছিলাম না। তবে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়। ঠিক ঠিক সেখানে পানি ছিল না। বেশি দুর্বল লাগায় বাধ্য হয়ে চারতলায় উঠলাম। চারতলার ওয়াশরুমটা পাঁচতলায় ওঠার সিঁড়ির পাশেই, আমার গা ছমছম করে উঠল। যখন আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিচ্ছিলাম, হঠাৎ শুনি, ওয়াশরুমে কে যেন একবার ঢুকে দৌড়ে বের হয়ে গেল। মুখে পানি থাকায় খেয়াল করিনি। শুনলাম, আমার বান্ধবী দুইবার চেঁচিয়ে ডাকল আমাকে। বলল, 'কী রে ফারনাজ, তাড়াতাড়ি আয়। চল একটু পাঁচতলায় গিয়ে ঘুরে আসি।' তৃতীয়বার ডাকার সময় আমি সাড়া দিয়ে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম, আমাকে রেখেই পাঁচতলায় উঠে গেছে ওরা। আমি উঠতে চাইলাম না, ভয় লাগল। তবে কিসের আকর্ষণ যেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল। এটি ছিল আমার জীবনের অন্যতম ভুল সিদ্ধান্ত।

পাঁচতলায় উঠে দেখি, সেখানে মানুষ তো দূর, একটা কাকপক্ষীও নেই, আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল, এ কার ডাক শুনলাম আমি!

হঠাৎ দেখি, করিডরের একদম কোনার ক্লাসরুমের সামনে কে যেন নিচে বসে হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

একটি কালো ছায়া!

হঠাৎ দেখি ছায়াটি আমার সামনে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর আমি জায়গায় স্থির হয়ে গেছি। একচুলও নড়তে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখলাম, ছায়াটা অদ্ভুত একধরনের চিৎকার দিয়ে বারান্দা থেকে লাফ দিল। ভেতর থেকে কেঁপে উঠলাম আমি। দেখি, আমার চারপাশের সবকিছু ঝাপসা হয়ে উঠল। ব্যস, আমার আর কিছু মনে নেই।

চোখ খুলে দেখলাম, আমার মা ও বান্ধবীরা আমার চারপাশ ঘিরে বসে আছে, আর আমি করিডরেই পড়ে আছি। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল।

বাসায় যাওয়ার পর আমার এক সপ্তাহ টানা জ্বর ছিল। তাই ক্লাস পার্টিটা মিস করেছিলাম। কে ছিল সেই ছায়া?

আমিনা ফারনাজ
অষ্টম শ্রেণি, ইস্পাহানি পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম

গেলাম। সবাই অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে ডুবে গেল?' আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'ছোট আন্টি ডুবে গেল!' আমার কথা শুনে সবাই দৌড়ে পুকুরে গেল, আমিও তাদের সঙ্গে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি, আন্টি সিঁড়িতে বসে বসে হাসছেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'তোমাকে একটু ভয় দেখানোর জন্য এমন করলাম।' শুনে আমার মাথার রক্ত রাগে টগবগ করে উঠল। ওই দিন রাগ করে ছোট আন্টির সঙ্গে আর কথাই বলিনি।

মাহিয়া আক্তার
দশম শ্রেণি, বন্দর কর্তৃপক্ষ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

সেই স্কুলটা

২০ ডিসেম্বর ২০২২। যেদিন ওই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। বেশ নার্ভাস লাগছিল। কারণ, আগে কোনো ভর্তি পরীক্ষা দিইনি। কেমন প্রশ্ন আসবে, তা সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। ওই দিন স্কুলটাকে কত বিশাল মনে হয়েছিল! তারই তিনতলার একটা রুমে বসে আমরা অপেক্ষা করছিলাম, কখন ভাইভার জন্য ডাকবে। সেদিনই জীবনের প্রথম ভাইভা দিলাম। এত্ত সহজ প্রশ্নগুলোও কেমন জানি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। পরীক্ষা-টরীক্ষা দিয়ে বাসায় এলাম। কয় দিন পর শুনলাম, সিলেক্ট হয়ে গেছি! সেই থেকে শুরু, আমার আরসিপিএসসির সঙ্গে পথচলা।

প্রথম কিছুদিন একটু একা লাগলেও একদিন একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো, যার সঙ্গে ভাইভার দিনই পরিচয় হয়েছিল, তাজকিয়া। তার কিছুদিন পর আরও একজনের সঙ্গে কথা হলো, যার নাম ফাতেমা। তার পর থেকে তিনজন সব সময় একসঙ্গেই থাকতাম। কত্ত মজা করেছি দিনগুলোতে! স্কুলে থেকেও কীভাবে ক্লাস ফাঁকি দেওয়া যায়, তা তো ওদের কাছ থেকেই শিখেছিলাম। তিনজনে মিলে বেতন দেওয়ার কিউতে দাঁড়িয়ে থাকার ভান করে ফাজলামি করে বেড়াতাম। ক্লাসের মাঝখানে কীভাবে টিচারদের থেকে লুকিয়ে কথা বলা যায়, তা বোধ হয় আমাদের চেয়ে ভালো কেউ জানত না। স্কুলের লাইব্রেরিতে বসে অপাঠ্যপুস্তক পড়া, যে বইয়ের ডাবল-ট্রিপল কপি আছে, তার একটা নিয়ে টানাটানি করা, একজনের টিফিন বাকি দুজন মিলে ফিনিশ করে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ছিল আমাদের দৈনন্দিন কাজ (বা অকাজ)। এই ছোট ফাজলামিগুলো যেন স্কুলের আনন্দটাকে আরও বাড়িয়ে দিত। মাত্র একটা বছর অথচ এর মধ্যেই স্কুলটা, স্কুলের ফ্রেন্ড, বাগান-লাইব্রেরি—সবকিছুই কত আপন হয়ে গিয়েছিল!

আমি যে স্কুলটা ছেড়ে চলে আসব, তা কেউই বুঝতে পারেনি শেষ দিনে। আমি নিজেও তো জানতাম না! তারপরও কেন জানি খুব কান্না পাচ্ছিল। হয়তো এটুকু অনুভব করতে পারছিলাম যে এখানে, এই স্কুলটাতে আর আসা হবে না। আগামী বছরের সেভেনের হাজিরা খাতায় আমার নামটা লেখা হবে না।

এখনো সবার সঙ্গে যোগাযোগ আছে ঠিকই, তবু তো আর একসঙ্গে ক্লাস করা হচ্ছে না। ক্লাসের খুনসুটি, গুঁতোগুঁতিগুলোর মজা কি আর মোবাইলের মাধ্যমে পাওয়া যায়?

সেই স্কুলের যত আনন্দের স্মৃতি আছে, সেগুলোকে নতুনভাবে সাজাতে আমি আবার ওই স্কুলে ফিরে যেতে চাই, আরসিপিএসসিতে, রামু ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজে।

রাইসা
সপ্তম শ্রেণি, আবুল কালাম আজাদ উচ্চবিদ্যালয়, কক্সবাজার

মাঠে মিতালি

চৈত্রের দুপুর। গ্রামের স্কুলের মাঠে ধুলা উড়িয়ে ক্রিকেট খেলছে একদল কিশোর। মাঠের ঠিক মাঝখানে রহিম দাঁড়িয়ে আছে। তার গলায় স্পষ্ট নির্দেশ, 'ফিল্ডিং টাইট করো! শেষ বল!' শোভন বল হাতে প্রস্তুত। কামাল উইকেটের পেছনে চিৎকার করছে, 'ধর ধর, আউট কর!'

বল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলা শেষ। মাঠে ধুলা আর শোরগোল। আজ শুধু অনুশীলন, কিন্তু তাদের জন্য প্রতিদিনই যেন একটা যুদ্ধ।

রহিমের জীবন শুধু মাঠেই নয়, বাড়িতেও যুদ্ধ। তার বাবা চান সে পড়াশোনায় মনোযোগ দিক। 'এই খেলার পেছনে সময় নষ্ট না করে পড়ালেখায় মন দাও,' প্রায়ই বকা দেন। কিন্তু রহিমের জন্য ক্রিকেট শুধু খেলা নয়, তার স্বপ্ন।

তানিম, দলের সেরা অলরাউন্ডার, প্রতিদিনই স্বপ্ন দেখে বড় ক্রিকেটার হওয়ার। কিন্তু তার মা বলে, 'তুই তোর বাপের মতন শ্রমিক হবি নাকি? পড়াশোনা ছাড়া কিছু হবে না!'

অন্যদিকে শোভন পুরো দলে সবচেয়ে চুপচাপ। বাবার অসুস্থতার জন্য অনেক দিন খেলা থেকে দূরে ছিল। কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে নামলে সব কষ্ট যেন ভুলে যায় সে। কয়েক দিন পর স্কুলে ঘোষণা এল আন্তস্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। খবরটা শুনে সবাই উচ্ছ্বসিত। কিন্তু রহিমের দল বুঝতে পারল, তাদের পথ সহজ নয়। তাদের কাছে ভালো ব্যাট, বল কিংবা জার্সি নেই। প্রতিপক্ষ রাশেদের দল, যাদের কাছে সব আধুনিক গিয়ার।

'আমাদের কীভাবে হবে?' শোভন বলল।

রহিম হেসে বলল, 'গিয়ার দিয়ে খেলা হয় না। মনের জোর আর বন্ধুত্ব থাকলেই সব হয়। শুরু করি!'

প্র্যাকটিসের মাঝখানেই মাঠে এল নতুন একটি মুখ—আবির। শহর থেকে নতুন এসেছে। ক্রিকেটে সে-ও দারুণ পারদর্শী। কিন্তু প্রথম দিনই শোভন তাকে ভুল বুঝল। আবির কিছু টেকনিক্যাল পরামর্শ দিল আর শোভন ভেবে বসল, সে নিজেকে বড় কিছু মনে করছে।

রহিম বলল, 'শোন, ও আমাদের দলে যোগ দিলে উপকারই হবে। নতুনদের কাছ থেকেও শেখা যায়।'

ক্রমেই দলের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হয়ে উঠল আবির। তার কাছে একটি পুরোনো ব্যাট ছিল। অনুশীলনে ব্যবহার করতে দিয়েছিল সেটা। ধীরে ধীরে, শোভন-আবিরের বন্ধুত্বও জমে উঠল।

একদিন প্র্যাকটিসের সময় কামাল মজার ছলে শোভনের বল নিয়ে দৌড়াতে গিয়ে পড়ে যায়। মাঠজুড়ে হাসি। কিন্তু এই হাসির মধ্যেই শোভন নিজের হাতের ব্যথা আড়াল করে। সে ভেবেছিল, দলের প্র্যাকটিস বন্ধ হয়ে যাবে, যদি তারা জানে।

তানিমেরও একটা সমস্যা তৈরি হয়। মা তার খেলা

আমার কাণ্ড

কিআ-সংখ্যা গণনা

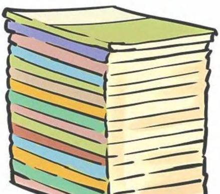

কিছুদিন আগে আমি আমার 'ডিজিটাল প্রযুক্তি' পাঠ্যবইটি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি আসলে স্কুলে যাওয়ার আগের রাতে ব্যাগ গোছাই। তখন সব বই-খাতা ঢোকানোর সময় কিছু একটা নেই-নেই মনে হলো। গুনে দেখি একটা বই কম! বইটা কোথায় গেল? বইটাকে খুঁজতে আমি পুরো বাড়ি মাথায় তুলে ফেললাম, তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। পেলাম না। পরদিন স্কুলে যাওয়ার আগে বুকশেলফে আমার কিআ সংগ্রহ বের করলাম, কয়টা জমা হলো দেখার জন্য। পরে দেখি, পত্রিকাগুলোর ভেতরই আমার বইটা! (আসলে আমি আগের রাতে সব কটা কিআ মাস অনুযায়ী গোছাচ্ছিলাম, তখনই হয়তো মা পত্রিকার সঙ্গে বইটা রেখে দিয়েছিলেন)

হুহ! কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম সেদিন (কারণ, বই না নিয়ে গেলে স্যারের কাছে বকুনি খেতে হতো।)

উদ্ভিদকাণ্ড

'কাল আমাকে গাছ নিয়ে যেতে হবে। সেটার ওপর নম্বর প্রদান করবে টিচার। নার্সারিতে চলো।' বাবাকে বললাম আমি। আসলে সেদিন বলা হয়েছিল, গাছ কিনে বা বাসা থেকে আনতে হবে। আমার আসলে শুক্রবারে কোচিং থাকে। তাই মাঝেমধ্যে স্কুল-কোচিংয়ের দ্বিধায় ভুগি। যেই ভাবা সেই কাজ। নার্সারিতে গিয়ে পছন্দমতো ফুলের গাছ নিয়ে মনের খুশিতে বাড়িতে এলাম।

পরদিন স্কুলে গাছ হাতে ঢোকার সময় সবাই এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, যেন মনে হচ্ছে আমার হাতে কোনো এলিয়েন। পরে সবার কথায় জানতে পারলাম, স্কুলে নয়, কোচিংয়ে গাছ আনতে বলা হয়েছিল!

রাইয়ান শরীফ
ষষ্ঠ শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রথম কথা বলা

আমি যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তাম, তখন খুব চুপচাপ ছিলাম। আমার কোনো বন্ধু ছিল না। সবাইকে দেখলে আমার লজ্জা লাগত, ভয়ও পেতাম। কয়েক দিন পর যখন কথা বললাম, তখন কিছু মেয়ে আমাকে বলল, 'তুমি আজকে জীবনে প্রথম কথা বলেছ।' সবাই আমাকে ভদ্র মেয়ে বলত। সবাই বলত, চুপচাপ মেয়েটা কি আজ আসেনি?

ইপ্সিতা
দ্বাদশ শ্রেণি, শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ

নিয়ে আবার আপত্তি জানান। 'যদি টুর্নামেন্টে নামো, তবে ঘরে ফেরার দরকার নেই!' মা বলেছিলেন।

'তুমি কী করবে?' রহিম জিজ্ঞেস করল।

তানিম একমুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'আমি খেলব। কারণ, আমার স্বপ্ন বড়। একদিন তোমরা সবাই দেখবে।'

কামাল তার হাস্যরসের আড়ালে দলের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে চলেছে। সে তার কমিক বই বিক্রি করে নতুন বল কিনে দিল।

টুর্নামেন্ট শুরু হলো। রহিমের দল প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত খেলল। তাদের ফিল্ডিংয়ে সবাই মুগ্ধ। কিন্তু রাশেদের দল ফাইনালে ওঠার পর তাদের ওপর কটাক্ষ করা শুরু করল।

'তোমাদের দিয়ে হবে না,' রাশেদ বলল। 'শেষ ওভারে ১০ রান চেজ করা তো দূরের কথা, ঠিকঠাক মাঠে দাঁড়াতেই পারবে না।'

রহিম মাথা ঠান্ডা রেখে বলল, 'শেষ পর্যন্ত খেলব। মাঠেই দেখা হবে।'

ফাইনালের দিন। মাঠভর্তি দর্শক। রাশেদের দল প্রথমে ব্যাটিং করে ৯৬ রান তোলে। জেতার জন্য ৯৭ রান দরকার। কিন্তু উইকেট পড়তে শুরু করে দ্রুত।

শেষ ৩ ওভারে দরকার ৩৫ রান। আবির আর তানিম ক্রিজে। আবির ৪টি চারে রানটা কমিয়ে আনে। শেষ ওভারে দরকার ১২ রান। আবির আউট হয়ে গেলে ক্রিজে আসে শোভন।

হাতের চোট নিয়ে ব্যাট করতে পারল না শোভন। কিন্তু সে ঠিক করল, রান নেওয়ার ঝুঁকি নেবে। তার ওপর ভরসা রাখল তানিম। শোভন এক দৌড়ে রান নিল, আর তানিম শেষ বলে ছক্কা মেরে ম্যাচ জিতল।

ফাইনালের পর পুরো দল আনন্দে মাতল। মাঠের চারপাশে কোলাহল। রহিমের বাবা মাঠে এসে তার মাথায় হাত রাখলেন। 'তোমার এই বন্ধুত্বই তোমার জীবনের বড় শক্তি। তোমাদের দেখে বুঝলাম, শুধু জিতলেই নয়, কীভাবে একসঙ্গে লড়াই করতে হয়, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ।'

কামালের প্রিয় কমিক বইয়ের গল্পটা শেষ হয়ে গেলেও তার বন্ধুত্বের গল্প শুরু হলো নতুন অধ্যায়ে। আর শোভন, যার আত্মবিশ্বাস কম ছিল, সে বুঝল, বন্ধুদের জন্য সে অনেক কিছু করতে পারে।

এহসানুল হক
দ্বাদশ শ্রেণি, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা

স্যারের বিদায়

বাকি দিনগুলোর মতো ১৪ নভেম্বরও স্কুলে অ্যাসেম্বলি হলো। ঘটনাটা ঘটল সর্বশেষ ক্লাসে, অর্থাৎ ষষ্ঠ পিরিয়ডে। ওই পিরিয়ডে আমাদের বিজ্ঞান ক্লাস ছিল। বিজ্ঞান ম্যাডাম আসতে দেরি করছিলেন, আমরা স্বভাবতই চিল্লাচিল্লি করছিলাম। হঠাৎ রেজবান স্যার এসে উপস্থিত হলেন। আমরা খুবই হতাশ হলাম। রেজবান স্যার পুরোনো আমলের মানুষ। স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তাঁকে ভয় পায়। স্যার ক্লাসে আসতেই সবাই চিল্লাচিল্লি বন্ধ করে সোজা হয়ে বসল। স্যার বললেন বিজ্ঞান বই দিতে, গতি অধ্যায় পড়াবেন। আমরা অবাক হইনি। নির্ধারিত স্যার বা ম্যাডামদের অনুপস্থিতিতে স্যার এর আগেও কয়েকবার ক্লাস নিতে এসেছিলেন। স্যার মার্কার নিয়ে গতির সমীকরণের অঙ্কগুলো করাতে শুরু করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে বিজ্ঞান ম্যাডাম এলেন। আমরা খুশি হলাম। রেজবান স্যারের ক্লাস আর করতে হবে না। কিন্তু বিজ্ঞান ম্যাডাম রেজবান স্যারকে দেখেই সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন যেন স্যার তাঁকে না দেখেন। আমরা তখনো কিছুই বুঝতে পারিনি। রেজবান স্যার ক্লাস নিলেন এবং বেল পড়ার ১০ থেকে ১৫ মিনিট আগে তিনি অঙ্ক করা শেষে গল্প শুরু করলেন। হঠাৎ আমার এক বান্ধবী স্যারকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, আপনি রিটায়ার করবেন কবে?' প্রশ্নটা ও করেছিল শুধু জানার জন্যই। জানুয়ারি থেকেই শুনছিলাম স্যার এ বছর রিটায়ার করবেন। ভেবেছিলাম স্যার রাগ করবেন এ প্রশ্ন শুনে। কিন্তু একটু হেসে তিনি বললেন, 'অপেক্ষা করো, বলছি।' তিনি বললেন, 'আমার জন্ম ১৯৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর। সরকারি চাকরি শেষ হয় ৫৯ বছর বয়সে এবং ১ দিন আগে। সেই হিসাবে ১৬ নভেম্বর। কিন্তু ১৬ তারিখ শনিবার, আর ১৫ তারিখ শুক্রবার। তাই আজ আমার শেষ দিন এবং আজ ঘণ্টা দেওয়ার পর থেকে আমার অবসর।' আমরা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে আজই স্যারের শেষ ক্লাস! পুরো ক্লাসরুমই যেন শেষ পাঁচ মিনিটে হয়ে উঠল বিষাদময়। অনেকেরই চোখে পানি এসেছিল। আমরা বুঝতেও পারিনি

যে স্যারকে আমরা এত ভালোবাসি। তিনি আরও বললেন, 'তোমাদের আমি অনেকবার বলেছি যে কোনো ক্লাস না হলে আমাকে ডেকে নিয়ে আসবে। আমি এসে ক্লাস নেব। তোমরা তো আমাকে কোনো দিন গিয়ে ডেকে আনলে না।' শুনে আমাদের অনেকের মনেই একটা অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি কোনো কোচিংয়ের শিক্ষক নন, নিছক একজন সিনিয়র স্কুলশিক্ষক, তা-ও আমাদের ক্লাস প্রায় নেন না বললেই চলে, তাঁকেও আমাদের ক্লাসের অনেক শিক্ষার্থী ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। বিদায়ের দিনে চোখের কোণে জল তার জ্বলন্ত সাক্ষী। আমিও বহু কষ্টে স্কুলে কান্না আটকে রেখেছিলাম, কিন্তু বাড়ি ফিরে তা আর আটকাতে পারিনি। আজ ১৭ নভেম্বর। স্যারের ৫৯তম জন্মবার্ষিকীতে লেখাটি লিখছি। যদিও এটা ছাপা হবে ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখের পর, তবু স্যারের উদ্দেশে বলতে চাই, স্যার, আপনি ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং জীবনের বাকি সময়টা সুন্দরভাবে উপভোগ করুন—এই প্রত্যাশা করি।

সুরাইয়া সালাহউদ্দিন
নবম শ্রেণি, মিঠাপুকুর সরকারি মডেল উচ্চবিদ্যালয়, রংপুর

অলংকরণ : **সব্যসাচী চাকমা**

উপন্যাস

তিন গোয়েন্দা
পান্না-রহস্য

কাহিনি রচনা : কাজী শাহনূর হোসেন
তিন গোয়েন্দায় রূপান্তর : শামসুদ্দীন নওয়াব

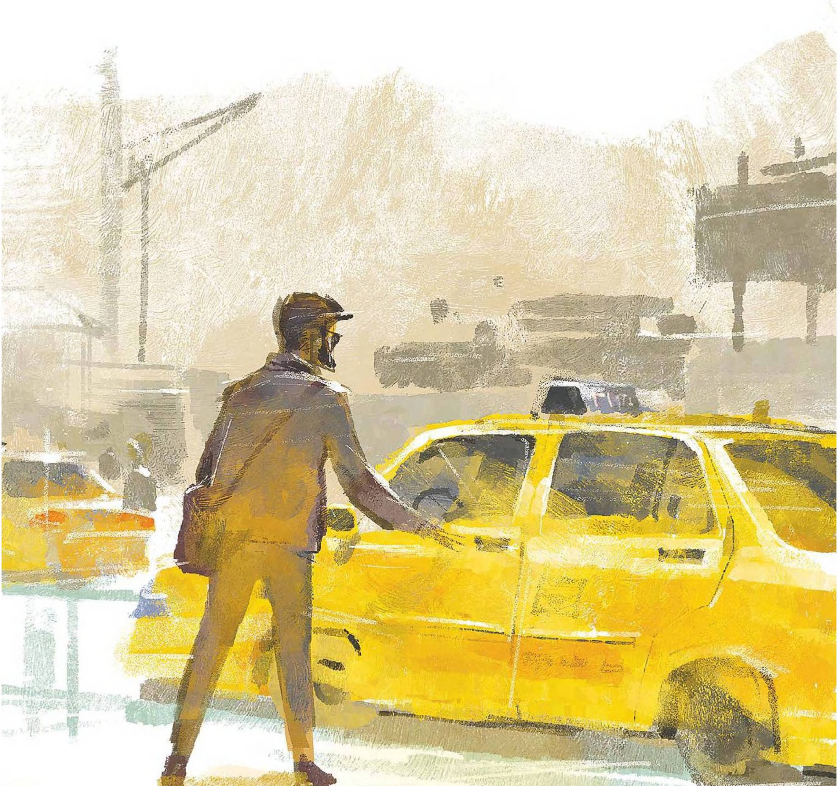

এক

কিশোর চিঠিটা হাঁটুর ওপর রেখে জোরে পড়ে শোনাল :

'প্রিয় কিশোর,

তুই আসছিস বলে আমার খুব ভালো লাগছে। তোর আর তোর বন্ধুদের নিউইয়র্ক ভালো লাগবে। শুক্রবার চারটের সময় এয়ারপোর্টে থাকব আমি।

ভালোবাসা নিস,

হিরু চাচা।'

হিরু চাচা কিশোরের বাবার চাচাতো ভাই। বিজ্ঞানী মানুষ। বিয়ে-থা করেনি। দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ায়। কোনো কাজে বেশি দিন থিতু হয় না।

হিরু চাচা ওদের নিতে এসেছে। কোটের কলারে লাল গেলাপ। চোখে সানগ্লাস।

'এসেছিস?' চেঁচিয়ে উঠল হিরু চাচা। 'খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই!'

'চাচি আমাদের জন্য স্যান্ডউইচ করে দিয়েছিল,' জানাল কিশোর।

'গুড। এখন চল, ক্যাব ভাড়া করি!'

এয়ারপোর্টের বাইরে বেরোতেই কানে তালা লাগার জোগাড়। হর্ন বাজছে, কড়া ব্রেকের শব্দ, উচ্চ স্বরে গান আর খাবারের দোকানদারদের ডাকাডাকি।

হিরু চাচা হাত নেড়ে শিস বাজাল। হলদে একটি ক্যাব শাঁ করে এসে হিরু চাচার পায়ের কয়েক ইঞ্চি দূরে ব্রেক কষে দাঁড়াল।

পেছনের দরজা টেনে খুলল হিরু চাচা।

'ঢুকে পড়!' চেঁচাল।

বসে দরজা সবে লাগিয়েছে, ঝাঁকি মেরে রওনা হলো ক্যাব।

'কোথায়?' কাঁধের ওপর দিয়ে প্রশ্ন করল ড্রাইভার মহিলা।

'নাম্বার থ্রি ফর্টি, ওয়েস্ট ওয়ান হানড্রেড অ্যান্ড টেন্থ স্ট্রিট,' হিরু চাচা বলল।

এবার ছেলেদের দিকে ঘুরে চাইল।

'আগে জাদুঘরে যাব। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে একটা শিপমেন্ট আসার কথা।'

চওড়া এক অ্যাভিনিউয়ে এঁকেবেঁকে ঢুকল গাড়ি। অগুনতি গাড়ি, ট্যাক্সি, বাস, বাইক আর মানুষ পরস্পর পরস্পরকে এড়ানোর প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। ট্যাক্সির বন্ধ জানালার ভেতর থেকেও বিশাল শহরটার হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারছে কিশোর।

বিশ মিনিট বাদে, ট্যাক্সি সাদা মার্বেলের তৈরি এক বিল্ডিংয়ের সামনে থেমে দাঁড়াল।

'পৌঁছে গেছি,' জানাল ড্রাইভার।

হিরু চাচা তার হাতে বিল গুঁজে দিল।

'কিপ দ্য চেঞ্জ, প্লিজ,' বলল।

'ধন্যবাদ, মিস্টার' বলে রিয়ারভিউ মিররে হাসল মহিলা।

ট্যাক্সি থেকে নেমে এল হিরু চাচা আর তিন গোয়েন্দা।

'আমি এখানে কাজ করি,' বলল চাচা। সবুজ এক দরজার পাশে তামার ছোট এক সাইন ইঙ্গিত করল। সাইন বলছে : দ্য পোর্টার মিউজিয়াম।

চারদিক শান্ত। বিল্ডিংয়ের সামনে গাছপালার সারি। কয়েকটা ছেলেমেয়ে সাইডওয়াকে চক দিয়ে ছবি আঁকছে। রাস্তার ওপাশের একটি জানালা দিয়ে পিয়ানোর শব্দ আসছে।

হঠাৎ একটি কণ্ঠ শোনা গেল, 'হিরন! হ্যালো!'

জাদুঘরের পাশে ছোট একটা রেস্তোরাঁ। তার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা।

তাঁদের পেছনে চওড়া একটি জানালায় সাইন। তাতে লেখা : লে পেটি বিস্ট্রো।

'আয়, আমার বন্ধুদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই' বলে হিরু চাচা তাঁদের দিকে এগোল।

ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

'এ হচ্ছে জাঁ পিয়েরে আর ইনি ওর স্ত্রী মিশেল,' বলল হিরু চাচা।

সাইনটা দেখাল সে।

'এরা শহরের সেরা ফরাসি রেস্টুরেন্টটার মালিক!'

'হ্যালো!' মহিলা আর পুরুষ একই সঙ্গে বললেন। মুখে মৃদু হাসি।

'নাইস টু মিট ইউ,' ছেলেরাও কোরাসে বলল।

মিশেল ঘুরে দাঁড়ালেন হিরু চাচার দিকে।

'এসেছে! বড়, ভারী একটা বাক্স। চারজন মিলে ওপরে তোমার অফিসে নিয়ে গেছে।'

পকেটে হাত ঢোকালেন জাঁ পিয়েরে।

'আমি ওদের সাথে গিয়েছিলাম। ওরা চলে গেলে লক করে দিয়েছি,' বলে এক গোছা চাবি তুলে দিলেন হিরু চাচার হাতে।

'বাক্সে কী আছে?' কিশোরের প্রশ্ন।

চোখ টিপল হিরু চাচা।

'তেমন কিছু না, স্রেফ মহামূল্যবান সোনা!'

দুই

সবুজ দরজা দিয়ে হিরু চাচাকে অনুসরণ করল ছেলেরা। কার্পেটে মোড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে একটি দরজার সামনে দাঁড়াল তারা। হিরু চাচা তালা খুলতেই ওরা প্রশস্ত, স্বল্পালোকিত একটি কামরায় প্রবেশ করল।

মেঝেতে কাঠের একটি বাক্স। প্রায় কিশোরের সমান লম্বা।

ঘরের চারপাশে নজর বুলিয়ে নিল কিশোর। প্রাচ্যের একটি গালিচার ওপরে একটা ডেস্ক আর কিছু চেয়ার। ডেস্কের কাছে বুদ্‌বুদ তুলছে এক মাছের ট্যাংক। দেয়ালে ঠেস দেওয়া একটি বুককেস।

কিশোর আরেকটা দরজা দিয়ে উঁকি মেরে একটি ডেস্কের ওপর কম্পিউটার, একটি ফাইল ক্যাবিনেট আর কিছু বুকশেলফ দেখতে পেল।

'আমার সহকারী ওখানে কাজ করে,' বলল হিরু চাচা। 'বিকেলে ছুটি নিয়েছে। আজকে ওর মেয়ের জন্মদিন, তাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গেছে।'

'এখানে চিড়িয়াখানা আছে?' মুসার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ, ম্যানহাটানের মাঝখানে সেন্ট্রাল পার্ক চিড়িয়াখানা,' বলল হিরু চাচা। 'খুব ছোট, তবে ব্রংক্স চিড়িয়াখানাটা বিশাল!'

দেয়ালের তিনটি সুইচ টিপে দিল হিরু চাচা। সিলিং ফ্যান চালু হয়ে গেল। গুপ্ত স্পিকার থেকে বাজনা শোনা গেল। মাথার ওপর থেকে আলো এসে পড়ল ওদের ওপর।

'অফিসটা দারুণ,' বলল কিশোর।

'ধন্যবাদ,' বলল হিরু চাচা।

মাছের ট্যাংকটার দিকে আঙুল নির্দেশ করল।

'মাছেদের কে খাওয়াতে চাও?'

'আমি!' বলে উঠল রবিন।

হিরু চাচা ওকে মাছের খাবারের একটা প্যাকেট দিল। বলে দিল কতখানি খাবার ছিটাতে হবে।

'এটা দেখো!' বলে ডেস্ক থেকে চকচকে একটি রুপোলি ছোরা তুলে নিল মুসা। ফলা বাঁকানো, হাতলটা বাজপাখির মতো।

'সাবধান, ভীষণ ধার। আমি ওটাকে চিঠি খোলার জন্য ইউজ করি,' বলল হিরু চাচা।

'এটা কি সত্যিকারের রুপা?' মুসার প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল হিরু চাচা।

'জিনিসটা স্পেনে তৈরি, প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো।'

'এতে আমার প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে!' বলল মুসা।

হেসে উঠল হিরু চাচা।

'এর কারণ আমার সহকারী রোজ সকালে ওটাকে পালিশ করে।'

টি-শার্টে ছোরাটা মুছে ডেস্কে রেখে দিল মুসা।

'এখন দেখা যাক এখানে কী আছে,' বলল হিরু চাচা। স্যুট-জ্যাকেট চেয়ারে ঝুলিয়ে ক্লজেট থেকে একটা টুলবক্স বের করল। ছোট একটি ক্রোবার বেছে নিল। বাক্সের ঢাকনার নিচে চোখা প্রান্ত ঢুকিয়ে ওপরটা তুলে ফেলল।

ভেতরে গাদা গাদা সাদা প্যাকিং পিনাট। পিনাটের মধ্যে হাত ভরে বাদামি কাগজে মোড়া ছোট একটি প্যাকেজ টেনে বের করল হিরু চাচা।

কাগজটা ছিঁড়ে প্লাস্টিক বাবল র‌্যাপের একটি স্তর বের করল। সাবধানী হাতে প্লাস্টিক খসাতেই বেরিয়ে পড়ল সোনার একটি কাপ।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসল হিরু চাচা।

'সুন্দর, তাই না? পনেরো শতকে ইনকাদের তৈরি ড্রিংকিং কাপ। কল্পনা কর, প্রায় পাঁচ শ বছর আগের! স্কুলে তোরা ইনকাদের কথা পড়েছিস?'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেরা।

'ওরা পেরুতে বাস করত। পোর্টার জাদুঘর ওদের কিছু

মৃৎশিল্প আর সোনার ভাস্কর্য ডিসপ্লে করবে।'

বাক্সের কিনারা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে পিনাটের গভীরে হাত ভরে দিল হিরু চাচা।

'আহা, এটা মনে হয় জাগুয়ারটা!'

খোঁত করে শব্দ করে অপেক্ষাকৃত বড়সড় একটি প্যাকেজ বের করল। কিশোরের বাহুর সমান লম্বা, কোমরের সমান মোটা। হিরু চাচা প্যাকেজটাকে ডেস্কের ওপর রাখলে 'ধুপ' করে শব্দ হলো।

'এটা এত ভারী কেন, হিরু চাচা?' মুসার প্রশ্ন।

'সোনা ভারী ধাতু,' ব্যাখ্যা করল হিরু চাচা। 'ইনকারা শক্তিমত্তা আর ধূর্ততার জন্য জাগুয়ারদের পছন্দ করত। এটা খাঁটি সোনার তৈরি। সামনের দুই থাবায় দুর্দান্ত এক পান্না রয়েছে এটার।

'দেখতে পারি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ, তবে কালকের আগে নয়। ড. ক্রুক সকাল নয়টায় এখানে আসবেন, সোসাইটি অব ইনকান ট্রেজার্সে কাজ করেন তিনি। প্রতিটি টুকরো র‍্যাপিং খুলে খুলে তাঁকে দেখতে হবে।'

'কেন?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'সবকিছু ঠিকঠাকমতো পৌঁছেছে কি না, শিওর হওয়ার জন্য। বুঝতেই পারছ এগুলো অমূল্য সম্পদ!'

বাক্সের ভেতর জাগুয়ারটাকে রেখে দিল হিরু চাচা।

'ঠিকমতো ঘুমা!' বলল।

এবার টুলবক্সে হাত ভরে একটি হ্যামার বের করল। মুসার হাতে দিল।

ভালোবাসি!'

হিরু চাচা দেয়ালের সুইচগুলো বন্ধ করে দিল। আলো, বাজনা, পাখা—সব বন্ধ হয়ে গেল। অফিস থেকে চাচাকে অনুসরণ করে বেরোল তিন বন্ধু।

'তাহলে তোদের সারপ্রাইজই দেব!' বলে দরজাটা লাগিয়ে দিল হিরু চাচা।

তিন

জাদুঘর থেকে কয়েক ব্লক দূরে চারকোনা, ধূসর এক বিল্ডিংয়ে থাকে হিরু চাচা।

সবুজ ইউনিফর্ম পরা লম্বা এক লোক দরজা খুলে দিল।

'গুড ইভনিং, মি. পাশা,' বলল লোকটা।

'হ্যালো, পিটার। ভাতিজারা, এ হচ্ছে পিটার পোলক।' কিশোরের কাঁধে হাত রাখল হিরু চাচা। 'এ আমার ভাতিজা, কিশোর, আর এরা ওর বন্ধু মুসা আর রবিন। গ্রিনহিলস থেকে এসেছে।'

ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসল পিটার।

'নিউইয়র্কে স্বাগতম,' বলল।

'এদের ব্যাকপ্যাকগুলো একটু দেখে রাখবে? আমরা ডিনারে বাইরে যাব কিনা। কোথায় যাওয়া যায় তুমিই বলো না,' বলল হিরু চাচা।

পেটে হাত বোলাল পিটার।

'পান্ডা গার্ডেনে চাইনিজ খেতে নিয়ে গেলে কেমন হয়?'

'দারুণ!' বলে উঠল হিরু চাচা। 'তোরা কী বলিস?'

চওড়া সাইডওয়কগুলোতে গিজগিজ করছে মানুষ। দোকানের জানালায় জানালায় জ্বলে উঠছে বাতি। এক বাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে স্যাক্সোফোন বাজাচ্ছে এক লোক। স্যাক্সোফোন কেসটা পায়ের কাছে খোলা

'এসো, কাপটাকে আবারও মুড়ে, পেরেক মেরে বাক্সটা বন্ধ করে দিই। কাল খুলব।'

কাজটা হয়ে গেলে হিরু চাচা বলল, 'এখন চলো এখানে তালা মেরে আমার অ্যাপার্টমেন্টে যাই। তোদের ব্যাকপ্যাক পিটারের কাছে রাখি, তারপর তোদের নিউইয়র্কের খানা খাওয়াব!'

'পিটার কে, হিরু চাচা?' মুসার প্রশ্ন।

'আমার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের দারোয়ান,' বলল হিরু চাচা। 'ভাড়াটেদের জন্য গেট খোলে, ট্যাক্সির জন্য হুইসেল দেয়।'

'আপনার বন্ধুর রেস্টুরেন্টে খাওয়াবেন না, হিরু চাচা?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, তবে আজকে নয়। তোরা চলে যাওয়ার আগের রাতের জন্য সেটা তোলা রইল। তোরা কী ধরনের খাবার পছন্দ করিস?'

'পিৎজা আর আইসক্রিম,' সবার হয়ে জবাব দিল মুসা।

হেসে উঠল কিশোর।

'মুসা সবই খায়।'

'আমি বলতে চাইছিলাম কোনটা খাবি—জাপানিজ, চায়নিজ, ইতালিয়ান, গ্রিক, ইন্ডিয়ান, নাকি মেক্সিকান খাবার!' হিরু চাচা জিজ্ঞেস করল।

'তোমার যা ইচ্ছে!' বলল কিশোর। 'আমরা সারপ্রাইজ

'আমাদের কোনো আপত্তি নেই,' জানাল মুসা। হাসি দুই কানে গিয়ে ঠেকেছে।

ব্রডওয়েতে হেঁটে এল ওরা।

চওড়া সাইডওয়কগুলোতে গিজগিজ করছে মানুষ। দোকানের জানালায় জানালায় জ্বলে উঠছে বাতি। এক বাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে স্যাক্সোফোন বাজাচ্ছে এক লোক। স্যাক্সোফোন কেসটা পায়ের কাছে খোলা। লোকে খুশি হয়ে পয়সা দিচ্ছে সেখানে। হিরু চাচা এক ডলার দিল। ছেলেরা দিল কিছু খুচরো। হাসি ফুটল স্যাক্সোবাদকের মুখে।

'এসে গেছি,' একটু পরে বলল হিরু চাচা। লাল, চকচকে এক দরজা নিয়ে পান্ডা গার্ডেন দাঁড়িয়ে, দুপাশে নকল পান্ডা। হাস্যমুখ এক মেজবান ওদের রেস্টুরেন্টে স্বাগত জানাল।

দুই ঘণ্টা পর চেয়ার থেকে পিছে হেলান দিল মুসা।

'পেটে আর জায়গা নেই,' বলল ও।

ওয়েট্রেস বিল এনে সবার সামনে একটা করে ফরচুন কুকি রাখল।

'কুকির ভেতর ভাগ্য গণনার স্লিপ পাবি,' বলল হিরু চাচা। 'কেউ কেউ মনে করে, কুকি খেলে কপাল খুলে যাবে!'

'আমি পরে খাব,' বলল রবিন। 'পেট একেবারে ঠাসা।'

'হ্যাঁ, বাসায় নিয়ে গিয়ে খাওয়া যায়,' বলল হিরু চাচা।

বিল মিটিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ওরা।

'আচ্ছা, চিকেনে কালো আঠালো জিনিসটা কী ছিল?' ব্রডওয়ে ধরে হাঁটার সময় বলল মুসা।

'সামুদ্রিক আগাছা,' জানাল রবিন।

'অসম্ভব!'

'রবিন ঠিকই বলেছে। সিউইড তো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো,' জানাল হিরু চাচা।

'মাছের স্বাস্থ্যের জন্য,' বলল মুসা।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তাই দ্রুত হাঁটল ওরা। অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছালে পিটার ওদের ব্যাকপ্যাক বুঝিয়ে দিল।

'ডিনার কেমন হলো?' প্রশ্ন করল।

'আমি কালো সিউইড খেয়েছি,' আওড়াল মুসা।

দাঁত বের করে হাসল পিটার।

'ভালো লেগেছে, তাই না?'

এগারো তলায় এলিভেটরে চড়ে উঠে এল হিরু চাচা আর তিন বন্ধু। এবার হল ধরে হেঁটে ধূসর এক দরজার কাছে চলে এল।

'আয়,' বলে ওদের পেছনে নিয়ে ভেতরে ঢুকল হিরু চাচা।

হিরু চাচার লিভিং রুম পুরোনো, আরামদায়ক চেহারার আসবাব দিয়ে ঠাসা। মেঝের কার্পেটটা পুরু আর নরম। উপচে পড়া বুককেসের মাঝখানের দেয়ালে পেইন্টিং ঝুলছে।

'দারুণ জায়গা, হিরু চাচা,' বলল রবিন।

'ধন্যবাদ, রবিন। কিশোর, তুই গেস্ট রুমে থাকবি,' বলল হিরু চাচা। 'রবিন আর মুসা লিভিং রুমের ফোল্ড-আউট সোফাটা শেয়ার করতে পারো।'

সবার পরনে যখন পায়জামা, ডাইনিং রুমের টেবিলে জড়ো হলো ফরচুন কুকি খোলার জন্য।

'সবচাইতে বয়স্কজন আগে পড়বে,' বলে কুকি খুলল হিরু চাচা।

নিঃশব্দে ভাগ্য গণনা পড়ে জোরে হেসে উঠল।

'আমারটা এর মধ্যেই ফলে গেছে। বলেছে, আজকে সুন্দর মনের মানুষদের সঙ্গে আমার দেখা হবে। হয়ে গেছে!'

'এবার আমি!' বলে কুকি ভাঙল মুসা। পাতলা কাগজটা বের করে আনল। জোরে জোরে পড়ল, 'অচেনা খাবার পছন্দ হবে তোমার।'

মুখ বানাল মুসা।

'এর মধ্যেই সিউইড খেয়েছি। আর কী বাকি আছে কে জানে!'

'আমার পালা,' বলল রবিন। কুকি খেয়ে ভেতরের কাগজটা দেখল ও। 'ওরে বাবা, বলছে অপ্রত্যাশিত জায়গায় গুপ্তধন খুঁজে পাব আমি!'

'এবার তুই, কিশোর,' হিরু চাচা বলল। 'তারপর সোজা বিছানা। কালকে ব্যস্ত দিন কাটবে আমাদের।'

কিশোর কুকিটা ভেঙে আপন মনে পড়ল।

'বুঝলাম না,' বলল।

'জোরে পড়ো,' বলল মুসা।

পড়ল কিশোর, 'তোমার চোখ তোমাকে ধোঁকা দেবে।'

হিরু চাচা মুচকি হাসল।

'তোর চোখ দেখে মনে হচ্ছে, ঘুম পেয়েছে। শুয়ে পড়!'

পরদিন নাশতা খেয়ে হিরু চাচা আর তিন বন্ধু হেঁটে গেল জাদুঘরে। এখনো বৃষ্টি পড়ছে, কাজেই দুটো ছাতার নিচে জড়াজড়ি করে চলেছে ওরা।

সিঁড়ির মাথায় ছোট ল্যান্ডিংটায় ভেজা ছাতা দুটো রাখল ওরা। ছাতার স্ট্যান্ডে আরেকটা ভেজা ছাতা দেখা গেল। হিরু চাচা দরজা খুললে ওরা অফিসে প্রবেশ করল।

দরজার ঠিক ভেতরেই এক লোক অভ্যর্থনা জানাল ওদের।

'ওহ, জেমস, তুমি এসে গেছ?' হিরু চাচা বলল। 'ছেলেরা, ইনিই জেমস ব্রাউন, আমার সহকারী। জেমস, এ আমার ভাতিজা কিশোর, আর এরা ওর বন্ধু রবিন আর মুসা।'

ছেলেদের দিকে চেয়ে হাসল জেমস।

'হিরন তোমাদের সাইটসিয়িংয়ে নিয়ে গেছে?' জিজ্ঞেস করল।

'এখনো নিইনি,' বলল হিরু চাচা। 'তবে কথা দিয়েছি, বৃষ্টি থামলে সেন্ট্রাল পার্কের মধ্য দিয়ে ওদের বাগি রাইড দেব।'

কাঠের বাক্সটায় টোকা দিল জেমস।

'এটার ভার তোমার ওপরই থাকল, হিরন। আমি পেপারওয়ার্কে পিছিয়ে গেছি।' নিজের অফিসে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

এ সময় বাইরের অফিসে টোকা পড়ল। হিরু চাচা দরজা খুলতেই ভেজা রেইনকোট পরা এক লোক উদয় হলেন।

'আমি ড. ক্রুক,' লোকটি বললেন। 'মি. পাশার সাথে আমার দেখা করার কথা।'

'আমিই পাশা!' হিরু চাচা বলল। লোকটির হাত ঝাঁকিয়ে দিল। 'ভেতরে এসে গা শুকোন। চা চলবে?'

'না, ধন্যবাদ। হোটেলে ব্রেকফাস্ট করে এসেছি,' জানালেন ড. ক্রুক। অফিসের চারধারে নজর বুলিয়ে বড় বাক্সটার কাছে হেঁটে এলেন। 'পৌঁছে গেছে দেখছি।'

'হ্যাঁ, কালকে এসেছে। কোট ঝুলিয়ে রাখুন, আমরা কাজে লেগে পড়ি,' বলল হিরু চাচা।

আবারও বাক্সের ঢাকনা খুলল হিরু চাচা। প্রতিটি টুকরা বের করে ড. ক্রুকের হাতে দিল। তিনি সাবধানে সব কটির মোড়ক খুললেন। ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করে প্রতিটা আইটেম পরখ করলেন, তারপর মিলিয়ে নিলেন এক তালিকার সঙ্গে।

ছেলেরা রির‍্যাপিংয়ে সাহায্য করল। আরও কয়েকটা সোনার কাপ, কটা খোদাই করা জন্তু, কিছু বাসনকোসন, আর জেড আর পালকে তৈরি রঙিন মুখোশ দেখা গেল।

'চমৎকার কন্ডিশনে আছে,' বলে তালিকায় চোখ রাখলেন ড. ক্রুক। 'কিন্তু জাগুয়ারটা কোথায়, মি. পাশা?'

বাক্সে হাত ঢুকিয়ে দিল হিরু চাচা।

'কিশোর, একটু সাহায্য করবি?'

তরতর করে এগিয়ে গেল কিশোর। দুজন মিলে লম্বা, ভারী প্যাকেজটা বের করল বাক্স থেকে।

'ওটা এখানে রাখুন, প্লিজ,' বললেন ড. ক্রুক। হিরু চাচার ডেস্কের ডান পাশে দাঁড়িয়ে তিনি।

'মাছের ট্যাংকটায় যেন না লাগে, কিশোর,' বলল হিরু চাচা। ভারী প্যাকেজটা দুজন মিলে নামিয়ে রাখল ডেস্কে।

ড. ক্রুক বাদামি কাগজটা খুলতেই সবাই তাঁকে ঘিরে এল।

প্লাস্টিক বাবল র‍্যাপ খোলা হতেই, 'খাইছে,' বলে উঠল মুসা।

জাগুয়ারটা খাঁটি সোনার তৈরি। রুবির চোখ মেলে শুয়ে রয়েছে। দুই থাবার মাঝে গলফ বলের সমান এক পান্না। আলোয় ঝিকমিক করছে সবুজ পাথরটা।

'কী দারুণ না?' বলে উঠল হিরু চাচা। 'কী অদ্ভুত সুন্দর হাতের কাজ!'

রুমালে হাত মুছে নিলেন ড. ক্রুক। এবার সোনার বাঘটার গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন।

'কী এটা?' বলে ঝুঁকে পড়লেন রত্নটার ওপর।

'কোনো সমস্যা?' বলল হিরু চাচা।

ম্যাগনিফাইং গ্লাস ভেদ করে রত্নটা জরিপ করলেন ড. ক্রুক।

এক মিনিট পর মাথা তুলে হিরু চাচার দিকে চাইলেন।

'স্যার, পাথরটা নকল!'

চার

'তার মানে? নকল হয় কীভাবে?' হিরু চাচা বিস্মিত।

রত্নটায় একটা আঙুল রাখলেন ড. ক্রুক।

'এটা আসল পান্নাটা নয়। এটা আদৌ পান্না নয়,' ব্যাখ্যা দিলেন।

'কিন্তু তা কী করে সম্ভব?' চেঁচিয়ে উঠল হিরু চাচা।

'এই দেখুন,' বলে পকেট থেকে খুদে এক ফ্ল্যাশলাইট বের করলেন ড. ক্রুক।

'শেডগুলো দয়া করে টেনে দিয়ে বাতি নেভাবেন?' প্রশ্ন করলেন।

রবিন কাছে ছিল, কাজেই ও শেডগুলো নামিয়ে দিয়ে ফিশ ট্যাংকের বাতিটা অফ করে দিল। মুসা শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে গেল দেয়ালের সুইচগুলোর দিকে।

ঘর অন্ধকার হয়ে গেলে নিজের ফ্ল্যাশলাইট জ্বাললেন ড. ক্রুক। আলো ফেললেন রত্নটির ওপর।

হঠাৎই নিভে গেল ফ্ল্যাশলাইট। কিশোর শুনতে পেল কিছু একটা ডেস্কটপে আঘাত করে, গড়িয়ে পড়ে মৃদু শব্দ করল কার্পেটে।

'সরি,' বললেন ড. ক্রুক। 'আমার ফ্ল্যাশলাইটটা পড়ে গেছে। কেউ কি প্লিজ...'

'আমি তুলে দিচ্ছি,' অন্ধকারে শোনা গেল মুসার গলা। হাঁটু গেড়ে বসে ডেস্কের নিচে, আশপাশে হাতড়াতে লাগল।

'পেয়েছি,' একমুহূর্ত পর বলল। উঠে দাঁড়াল, সুইচ অন করে ডেস্কের দিকে তাক করল।

'ধন্যবাদ, ইয়াংম্যান,' বললেন ড. ক্রুক। ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে রত্নটার দিকে নির্দেশ করলেন আবারও।

'এটা যদি সত্যিকারের পান্না হতো, তাহলে আলোটা ভেদ করে ঢুকে যেত,' ব্যাখ্যা করলেন। 'একেবারে পান্নাটার বুকে গিয়ে লাগত।'

রত্নটায় এক আঙুলের টোকা দিলেন।

'কিন্তু এটা স্রেফ কাচ। আলোটা কীভাবে বাউন্স করে ফিরে আসছে খেয়াল করুন। পাথরের ভেতর আলো ঢুকছে না।'

নিজের মুখে আলো ধরলেন তিনি।

'তবে এটা আমার নিজের মতামত। আপনি অন্য কারও মতও নিতে পারেন, মি. পাশা।'

'অবশ্যই নেব!' বলে উঠল হিরু চাচা।

দেয়ালের কাছে গিয়ে সুইচগুলো অন করে দিল।

কিশোর হঠাৎ আলোয় চোখ পিটপিট করল। মুষড়ে পড়েছে হিরু চাচা।

'কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আসল পান্নাটা কীভাবে নকলটার সাথে পাল্টাপাল্টি হয়ে গেল!' বলে চলল হিরু চাচা। 'আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত?'

মাথা ঝাঁকালেন ড. ক্রুক।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ব্যাপারটা ঘটেছে বাক্সটা আসার আগে,' ঘোষণা করল হিরু চাচা। 'হয়তো দক্ষিণ আমেরিকায়, যেখানে জাগুয়ারটা র‍্যাপ করা হয়েছে, ঘটনাটা সেখানেই ঘটেছে।'

ড. ক্রুক মাথা নাড়লেন।

'আমি দুঃখিত। প্যাকিংয়ের সময় আমি ওখানে ছিলাম। জাগুয়ারটাকে যখন বাক্সে ভরা হয়, তখন আসল পান্নাটাই ছিল।'

জাগুয়ারের দিকে চেয়ে রইল হিরু চাচা।

'কীভাবে সম্ভব, বুঝতে পারছি না!'

শ্রাগ করলেন ড. ক্রুক।

'আমাকে ব্যাপারটা পুলিশে জানাতে হবে,' বললেন। 'আপনি যদি দ্বিতীয় কারও মত চান...'

হিরু চাচা তড়িঘড়ি রুমটা পেরিয়ে জেমস ব্রাউনের অফিসের দরজা খুলল।

'জেমস, প্লিজ, ব্রডওয়ের এম্পায়ার জুয়েলারিতে ফোন করো। সেলিনা হায়েককে এক্ষুনি চলে আসতে বলো। বলবে খুব জরুরি!'

ওরা অপেক্ষা করছে, ড. ক্রুক অফিসের দরজার তালা পরখ করলেন, তারপর ছোট্ট এক প্যাডে কী সব যেন টুকলেন।

হিরু চাচা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে মূর্তিটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

ছেলেরা কার্পেটে বসে রয়েছে। হিরু চাচা এতটাই ভেঙে পড়েছে, কিশোর কোনো কথা বলতে গেল না।

দীর্ঘ কয়েক মিনিট পর দরজায় টোকার শব্দ হলো। তড়াক করে উঠে দাঁড়াল হিরু চাচা। কালো রেইনকোট পরা লম্বা এক মহিলাকে ঘরে ঢুকতে দিল।

'পাশা, তাড়াহুড়ো করে এসেছি,' বললেন মহিলা। 'রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট!'

পরস্পর হাত মেলানো হলে রত্নটার কথা বলল হিরু চাচা।

'ড. ক্রুক বলছেন জিনিসটা নকল!'

'আমি একটু দেখতে পারি?' বলে জুয়েলারের ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করে কয়েক মিনিট রত্নটা পরখ করলেন মিসেস হায়েক।

এবার পকেট থেকে খুদে এক শিশি বের করে রত্নটার ওপরে এক ফোঁটা তরল টিপে ফেললেন। তরলটুকু শুকিয়ে গেলে পাথরটা মুছে দিলেন কাপড় দিয়ে।

মাথা ঝাঁকালেন।

'উনি ঠিকই বলেছেন। এটা কাচের রেপ্লিকা।'

চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল হিরু চাচা।

'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। অদলবদলটা কোথায় হলো? কীভাবে? কে করল কাজটা...'

'মাফ করবেন, দরজার তালা দেখে শিওর হলাম, জোর খাটানো হয়নি। এই অফিসের চাবি আপনি ছাড়া আর কার কাছে থাকে?' প্রশ্ন করলেন ড. ক্রুক।

'আমার সহকারী জেমস ব্রাউনের কাছে। আর আমার বন্ধু জাঁ পিয়েরে। জাদুঘরের পাশের রেস্টুরেন্টটা তার। কালকে ডেলিভারিম্যানকে আমার অফিসে সে-ই ঢুকিয়েছিল।'

'এই জাঁ পিয়েরের কাছে তার মানে চাবি আছে?' ড. ক্রুকের প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল হিরু চাচা।

'থাকে না, আমি রাখতে দিয়েছিলাম। বাক্সটা যখন এল, আমি আর জেমস যেহেতু তখন অন্যখানে ছিলাম।'

'তো দুজন লোকের পক্ষে জাগুয়ারের কাছে আসা সম্ভব। একজন আপনার সহকারী আর অন্যজন বন্ধু,' বললেন ড. ক্রুক।

'হ্যাঁ, কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, ওরা কেউ মূর্তিটা টাচ করেনি।'

'উম, হিরু চাচা?' বলল কিশোর।

সবাই ঘুরে চাইল ওর দিকে।

'আসল পান্নাটা যে সরিয়েছে, তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে না?'

এক মিনিট সবাই নিশ্চুপ। এবার ড. ক্রুক হাসলেন কিশোরের উদ্দেশে।

'চমৎকার আইডিয়া। পুলিশকে বলা দরকার কথাটা। ওরা অবশ্য আমার হাতের ছাপ পাবে। এ ছাড়া আর কারওটা পাবে বলে মনে হয় না।'

'কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'কারণ, চোরটা খুবই চালাক। আর চালাক চোরেরা গ্লাভস পরে।'

ফোনের দিকে ভ্রু দেখাল হিরু চাচা।

'প্লিজ, পুলিশ ডাকুন। তারা প্রমাণ করবে জেমস আর জাঁ পিয়েরে নির্দোষ!'

ড. ক্রুক চাইলেন হিরু চাচার দিকে।

'মাফ করবেন, কিন্তু এখানে আরেকজন সাসপেক্ট আছেন।'

'কে?' হিরু চাচা জবাব চাইল।

'আপনি,' শান্ত স্বরে বললেন ড. ক্রুক।

পাঁচ

সিঁড়িতে ভারী পদশব্দ তুলে অফিসে প্রবেশ করল দুজন পুলিশ অফিসার। পুরো কাহিনি সবিস্তার শুনে হিরু চাচাকে 'আমন্ত্রণ' জানাল থানায় গিয়ে কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য।

'মি. পাশা, মি. জেমস আর জাঁ পিয়েরেকেও আমাদের সঙ্গে যেতে বলুন,' এক অফিসার বলল।

'বলব, তবে বিশ্বাস করুন, এটা বিশ্রী একটা মিসটেক ছাড়া আর কিছু না,' বলল হিরু চাচা।

অফিসার মাথা ঝাঁকিয়ে মূর্তিটার দিকে আঙুল দেখাল।

'এটাকেও নিয়ে যাব আমরা। ফিঙ্গারপ্রিন্টের জন্য পরীক্ষা করতে হবে।'

'আমি আর ড. ক্রুক কি ফিরে যেতে পারি?' প্রশ্ন করলেন সেলিনা।

'আপনাদের ঠিকানা আমাদের কাছে আছে। কোথায় পাব জানি,' অফিসার বলল।

'নিশ্চয়ই,' বললেন ড. ক্রুক। তিনি আর সেলিনা হায়েক বিদায় নিলেন।

কিশোরের কাছে হেঁটে এল হিরু চাচা।

'ঘাবড়াস না, বেশিক্ষণ লাগবে না। আমি যতক্ষণ না ফিরি, মিশেলের সঙ্গে থাকিস।'

কিশোরকে জড়িয়ে ধরার জন্য ঝুঁকে কানে কানে বলল, 'কিশোর, তোর কুকিটার কথা মনে রাখিস!'

জেমস ব্রাউন অফিসে তালা দিল, তারপর সবাই মিলে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেল, দুই অফিসার মোড়ানো জাগুয়ারটা বইছে।

জাঁ পিয়েরে মিশেলকে জড়িয়ে ধরে পুলিশের একটা গাড়িতে উঠলেন।

বৃষ্টির মধ্যে রওনা দিল গাড়ি।

'রেস্টুরেন্টের ভেতরে এসো,' বললেন মিশেল। 'গা গরম করা দরকার। ওরা শিগগিরই ফিরে আসবে।'

বড় মগে হট চকলেট ঢাললেন ছেলেদের জন্য। জানালার কাছে বসে বৃষ্টি দেখতে লাগল ওরা।

'চিন্তা কোরো না। ওরা ফিরে এলেই রহস্যটার সমাধান করে ফেলব আমরা,' বললেন মিশেল।

নীল পর্দা পেরিয়ে রেস্তোরাঁর রান্নাঘরে চলে গেলেন তিনি।

'কী বিশ্রী ব্যাপার!' বলল কিশোর।

'হিরু চাচা অমন কাজ করতে পারে না,' জোর গলায় বলল মুসা।

'কিন্তু জিনিসটা গেল কোথায়? কেউ না কেউ তো আসল পান্নাটা চুরি করেছেই!' বলল রবিন।

ছেলেরা হট চকলেট পান করছে। বৃষ্টিভেজা জানালা ভেদ করে দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত।

উঠে দাঁড়াল কিশোর।

'বাথরুমে যাব,' বলল।

'মিশেলকে জিজ্ঞেস করো। উনি রান্নাঘরে,' বলল রবিন।

মুসা ওর ড্রিঙ্কের তলানিটুকু চোঁ চোঁ করে টান দিল।

'ওনার কাছে আরও হট চকলেট আছে কি না সেটাও দেখো!' বলল ও।

রেস্তোরাঁর পেছন দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল কিশোর। নীল পর্দা ঠেলে প্রবেশ করল রান্নাঘরে।

কাউন্টারে একবাটি কাঁচা পেঁয়াজের পাশে ব্রকলির কাটা টুকরো। চারধারে নজর বুলিয়েও মিশেলকে দেখতে পেল না ও।

আরেকটা নীল পর্দা দেখে বাথরুম মনে করে উঁকি দিল। ঠিক এমন সময় একটা শব্দ কানে এল। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখে, মিশেল সরু একটা দরজা দিয়ে ঢুকে গেলেন। দরজাটা ওনার পেছনে লেগে যেতেই অদৃশ্য হয়ে গেল!

চোখ পিটপিট করল কিশোর। দরজাটা চোখের সামনে হাওয়া! কোনো কাঠামো, নব কিংবা কবজা নেই। মাথা নাড়ল ও। কী দেখছে এসব আবোলতাবোল?

তাক করল। 'সেই অলংকারবিশেষজ্ঞ মহিলা!'

রেস্তোরাঁর পাশ দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন সেলিনা হায়েক। ছেলেরা তাঁকে সবুজ দরজা দিয়ে সন্তর্পণে ঢুকতে দেখল। হিরু চাচার অফিসে যাওয়া যায় ওটা দিয়ে।

'উনি ওখানে আবার যাচ্ছেন কেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

এ সময় মিশেল বেরিয়ে এলেন নীল পর্দা ভেদ করে। হাতে পিচার আর একপ্লেট কুকি।

'আরও হট চকলেট আর আমার স্পেশাল ক্রানবেরি কুকিস!'

মুসা আর রবিন কুকির দিকে হাত বাড়িয়েছে, কিশোর জানালা দিয়ে সবুজ দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল, আর বাইরে পা রাখলেন সেলিনা হায়েক। দরজাটা পেছনে লাগিয়ে হনহন করে পা চালালেন।

কিশোর তাঁকে ছাতা মাথায় চলে যেতে দেখল।

মহিলার পিঠের দিকে তাকিয়ে রইল ও। ব্যাপারটা কী? ভাবল। হিরু চাচা নেই জেনেও অফিসে গেল কেন?

এবার আচমকা আরেকটা চিন্তা ঘাই মারল ওর মাথায়। হয়তো চাচা নেই বলেই গেছে!

ছয়

মিশেল রান্নাঘরে না ফেরা অবধি অপেক্ষা করল কিশোর। তারপর বন্ধুদেরকে বলল, কী দেখেছে।

'কিন্তু অফিস তো বন্ধ,' বলল মুসা।

সিঁড়িতে ভারী পদশব্দ তুলে অফিসে প্রবেশ করল দুজন পুলিশ অফিসার। পুরো কাহিনি সবিস্তার শুনে হিরু চাচাকে 'আমন্ত্রণ' জানাল থানায় গিয়ে কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য

বাথরুম খুঁজে পেয়ে কাজ সেরে বন্ধুদের কাছে তড়িঘড়ি ফিরে এল।

সব কথা খুলে বলল ওদের।

'অদৃশ্য দরজা!' বলে উঠল মুসা। কণ্ঠে অবিশ্বাস।

'ওটা হয়তো ওনার প্রাইভেট বাথরুম কিংবা অন্য কিছু,' বলল রবিন।

হঠাৎই কিশোরের মনে পড়ল হিরু চাচা ওকে কী বলেছিল। 'তোর কুকিটার কথা মনে রাখিস।'

'হয়তো কুকিটার ভবিষ্যদ্বাণী মনে করতে বলেছিল,' শুনে বলল রবিন।

'আমি রেখে দিয়েছি ওটা,' বলে জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরে দিল কিশোর। 'আরে, এটা কী?' চাচার চাবির গোছা বেরিয়ে এল। 'এটা এল কোত্থেকে?'

'এটা তো মনে হচ্ছে হিরু চাচার অফিসের চাবির গোছা,' বলল মুসা।

'ঠিক বলেছ। খুব সম্ভব আমাকে জড়িয়ে ধরার সময় পকেটে ফেলে দিয়েছে,' বলল গোয়েন্দাপ্রধান।

পকেটে আবার হাত ভরে ফরচুন কুকির কাগজটা বের করল।

'তোমার চোখ তোমাকে ধোঁকা দেবে,' পড়ল।

'তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাচ্ছে!' বলল রবিন। 'আমারটা ফলবে কি না ভাবছি। আমার গুপ্তধন পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

'দেখো!' হঠাৎ বলে উঠল মুসা। জানালা দিয়ে আঙুল

'ওনার কাছে হয়তো চাবি আছে,' বলল কিশোর।

'চাবি পাবেন কোথায়?' প্রশ্ন করল মুসা। 'তোমার কাছে একটা, আরেকটা জেমস ব্রাউনের কাছে।'

'প্রশ্ন হচ্ছে, কেউ যখন নেই, তখন উনি ওখানে গেলেন কেন?' বলল রবিন।

উঠে দাঁড়াল কিশোর।

'আমাদের জানা দরকার। উনি হয়তো কোনো ক্লু রেখে গেছেন। মিশেল ফেরার আগেই যাই চলো।'

বৃষ্টির মধ্যে তড়িঘড়ি বেরিয়ে পড়ল ছেলেরা। পাশের বাড়িতে গিয়ে সবুজ দরজাটা দিয়ে ঢুকে পড়ল।

'দেখো,' বলে কার্পেটের দিকে আঙুল তাক করল কিশোর। 'ভেজা পায়ের ছাপ!'

সিঁড়ি ভেঙে তরতর করে উঠে গেল ওরা। সিঁড়ির মাথায় আরও কিছু ভেজা চিহ্ন।

কাঁপা হাতে অফিসের তালা খুলল কিশোর। মাছের ট্যাংকের বাতিটা ছাড়া ঘরে আলো নেই। শব্দ বলতে শুধু ট্যাংকটার বুদ্‌বুদ-ছাড়া ফিল্টার।

'খাইছে, জায়গাটা ভুতুড়ে,' ফিসফিস করে বলল মুসা।

মেঝে পরখ করল কিশোর।

'এখানে ভেজা পায়ের ছাপ নেই,' নিচু আওয়াজে বলল।

'সেলিনা হয়তো এখানে ঢোকার আগে পা মুছেছিলেন,' পাল্টা ফিসফিসাল রবিন।

'হয়তো, কিন্তু আমরা ফিসফিস করছি কেন?' বলে দেয়ালের সুইচগুলো অন করে দিল মুসা। জ্বলে উঠল বাতি, চালু হলো ফ্যান, শুরু হলো বাজনা।

চোখ পিটপিট করল কিশোর।

'ঠিক আছে, চারপাশটা একটু দেখা যাক।'

'কী জন্য?' মুসা বলল।

'জানি না, তবে সেলিনা হায়েক এখানে কোনো উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। হয় কিছু একটা নিয়ে গেছেন, নয়তো ফেলে গেছেন,' বলল কিশোর।

'আমি বাক্সটা দেখছি। কিশোর, তুমি জেমসের অফিসটা পরীক্ষা করে দেখো। মুসা, তুমি ট্র্যাশ ক্যান,' বলল রবিন।

'খাইছে, আমাকে কেন ট্র্যাশ ক্যান হাতড়াতে হবে?' বলল মুসা।

'কারণ, তুমি একজন ভালো গোয়েন্দা এবং ভালো গোয়েন্দারা সব সময় ট্র্যাশ ক্যান চেক করে,' বলল রবিন।

'ঠিক হ্যায়,' বলে ডেস্কের পাশে ট্র্যাশ ক্যানের দিকে এগোল মুসা।

কিশোর প্রবেশ করল মি. ব্রাউনের অফিসে।

ছোট একটা ডেস্ক। ড্রয়ারগুলো বন্ধ। ডেস্কে তিনজনের একটা ছবি।

জেমস ব্রাউন এবং নিশ্চয়ই তার স্ত্রী ও মেয়ে, ভাবল কিশোর।

এক কোনায় একটা ফাইল ক্যাবিনেট। বন্ধ। বুকশেলফে আঙুল চালাল কিশোর। কয়েকটা বইয়ের ভেতর খুঁজল, কী খুঁজছে নিজেও জানে না। এমনকি কার্পেটের তলায়ও উঁকি দিল। কিছু খোয়া গেছে কি না বলতে পারবে না ও, কোনো সূত্র খুঁজে পেল না।

বেরিয়ে যাবে, হঠাৎই চোখে পড়ল একটা দেয়াল অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। কেন বিসদৃশ লাগছে বোঝার জন্য তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে।

এবার উপলব্ধি করল কী ওটা : এই দেয়ালে কোনো বুকশেলফ, ফাইল ক্যাবিনেট, ছবি কিংবা কিছুই নেই! সম্পূর্ণ ফাঁকা।

কাছে গিয়ে ছেঁড়া ওয়ালপেপারে আঙুল বোলাল ও। মাথার ঠিক ওপরে সূক্ষ্ম একটা ফাটল অনুভব করল। ফাটলটাকে অনুসরণ করে আরেকটা ফাটল আবিষ্কার করল ও, এটা নেমে গেছে মেঝের দিকে। উল্টো দিকে দুই ফুট দূরে তৃতীয় আরেকটা ফাটল নেমে গেছে মেঝেতে। ফাটলগুলো ওয়ালপেপারে ঢাকা পড়েছে প্রায়।

হাতে আগুনের ছেঁকা খেয়ে যেন পিছিয়ে এল কিশোর।

'শুনে যাও!' চেঁচাল।

জেমসের অফিসে দৌড়ে এল রবিন আর মুসা।

আবিষ্কারটা বন্ধুদের দেখাল কিশোর।

'মনে হচ্ছে, এটা গোপন দরজা,' বলল।

ফাটলে জোর করে আঙুল ঢোকানোর চেষ্টা করল ও, কিন্তু দরজা একচুল নড়ল না।

'এই দেয়ালের পেছনে যদি সিঁড়ি থাকে, তাহলে সেটা সোজা মিশেলের রান্নাঘরের গোপন দরজার সঙ্গে মিশবে!' বলল রবিন।

মুসার চোখ বিস্ফারিত।

'খাইছে, তার মানে উনি এখানে চাবি ছাড়াই আসতে পারেন!'

'আমি যখন ওনাকে নিচে দেখি, তখন কি উনি এখানেই আসছিলেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

'হয়তো সেলিনা হায়েকের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাঁর। তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছেন।'

'হতে পারে,' বলে চাচার অফিসে ফিরে এল কিশোর। 'কিন্তু কেন?' আমাদের নজর রাখতে হবে। ট্র্যাশে কিছু পেলে, মুসা?'

'না,' বলল মুসা।

মেঝেতে রবিন যেখানে বসে ছিল, সেখানে প্যাকিং পিনাটের স্তূপ। প্রতিটা আর্টিফ্যাক্ট খুলে এক পাশে সরিয়ে রেখেছে।

'কাল যা দেখেছি তা-ই। কিছু খোয়া গেছে বলে মনে হচ্ছে না,' বলল ও।

ছেলেরা তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে। পর্দার পেছনে, ইরানি গালিচার নিচে। ডেস্ক-ড্রয়ার থেকে সবকিছু টেনে টেনে বের করেছে। এমনকি জানালার পাশে রাখা ফুলের টবগুলোর কাদাও ঘেঁটেছে।

'খোলে না এমন একটা গোপন দরজা ছাড়া কিছুই পেলাম না,' আওড়াল মুসা।

'আর মিশেল যেহেতু রান্নাঘরে আছেন, নিচের দরজাটাও আমরা পরীক্ষা করতে পারছি না,' বলল রবিন।

'তো এখন কী করা?' মুসার প্রশ্ন।

'জানি না।' বন্ধুদের দিকে তাকাল কিশোর। 'কিন্তু হিরু চাচা আমাদের ওপর ভরসা করছে। তার আশা, আমরা এখানে এমন কিছু খুঁজে পাব যাতে প্রমাণিত হবে যে সে দোষী নয়।'

সাত

'কিন্তু আমরা তো এর মধ্যেই সবকিছু দেখে ফেলেছি,' বলে কার্পেটে বসে পড়ল মুসা।

মাছের ট্যাংকটার কাছে গিয়ে খাবারের কনটেইনারটা তুলে নিল রবিন।

'ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত,' বলল ও। 'পানিতে খাবার ভাসছে। তোমরা কি কেউ খাবার দিয়েছ?'

'না,' বলল কিশোর।

'আমিও না,' জানাল মুসা।

পানিতে ভাসা খাবারের দিকে চেয়ে রইল রবিন।

'তাহলে কেউ দিয়েছে,' বলল।

'হয়তো মাছের পরি,' বলল মুসা।

'হায় খোদা!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন।

'কী হলো?' প্রশ্ন করল কিশোর। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। সে আর কিশোর শশব্যস্তে এগিয়ে এল।

'দেখো, নিচে কী!' বলে পানি ভেদ করে তর্জনী নির্দেশ করল রবিন।

কাচে নাক ঠেকাল মুসা।

'দেখে তো মনে হচ্ছে একঝাঁক পাথরের টুকরা।'

ভ্রু কোঁচকাল রবিন।

'একজন গিয়ে আলোটা নেভাও,' বলল।

কিশোরকে ঠেলা দিল মুসা।

'তুমি যাও।'

দেয়ালের কাছে গিয়ে সব কটা সুইচ অফ করল কিশোর। বাজনা, ফ্যান, আলো বন্ধ হয়ে গেল।

ট্যাংকের নিচে আঙুল তাক করল রবিন।

'সবুজ পাথরটা আলো ছড়াচ্ছে দেখেছ? আমার মনে হয় ওটাই পান্নাটা!'

মুসাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে পাথরটার দিকে চাইল কিশোর।

'না, এটা অনেক বড়। পান্নাটা গলফ বলের সমান ছিল।'

'পানির নিচে জিনিস সব সময় বড় দেখায়, চোখ তোমাকে আবারও ধোঁকা দিচ্ছে, কিশোর!' বলল রবিন।

রবিন হাত ডুবিয়ে দিয়ে ট্যাংক থেকে সবুজ পাথরটা তুলে আনল। জিনসে ওটাকে মুছতেই মেঝেতে পানির ফোঁটা পড়ল।

বাইরে বের করে আনাতে এখন আর অন্যান্য পাথরের মতো লাগছে না ওটাকে। ট্যাংকের আলোয় উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াচ্ছে পাথরটা।

'খাইছে! দুর্দান্ত!' বলে উঠল মুসা।

'এটা ওখানে গেল কীভাবে,' প্রশ্ন করল কিশোর।

'মনে হয় চোর রেখে গেছে,' বলল মুসা।

'কিন্তু চোর অমন কাজ করবে কেন?' কিশোরের প্রশ্ন।

মাথা ঝাঁকাল রবিন।

'চট করে জিনিসটা লুকানোর দরকার ছিল,' বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'জেমস এখানে সকাল সকাল এসেছিল। কাজটা হয়তো ওরই!' বলল।

'আলো জ্বেলে দিচ্ছি,' বলে দেয়ালের দিকে এগোল মুসা।

'থামো!' বলে উঠল কিশোর! 'শব্দটা কিসের?'

'কই শব্দ?' বলে সব কটা সুইচ অন করে দিল মুসা।

কিশোর এগিয়ে গিয়ে সুইচগুলো অফ করে দিল।

'এখন শোনো, শুনতে পাচ্ছ?' আঁধারে ফিসফিসিয়ে বলল।

'মনে হচ্ছে গুঞ্জনধ্বনি,' বলল রবিন।

'হয়তো মাছের ট্যাংকের শব্দ,' বলল মুসা।

বাল্বার অফ করে দিল রবিন।

'না, এখনো শোনা যাচ্ছে,' বলল।

'এখন আমিও শুনতে পাচ্ছি। কিসের শব্দ? সব তো বন্ধ,' বলল মুসা।

'শুধু বাতিগুলো জ্বেলে দেখি,' বলল কিশোর।

দৃষ্টি স্বচ্ছ হলে ছেলেরা অফিসটায় তল্লাশি চালাতে লাগল।

বুককেসের সামনে থমকে দাঁড়াল কিশোর।

'শব্দটা এখানে জোরাল!' বলল।

হেসে ফেলল মুসা।

'দ্য কেস অব দ্য বাজিং বুকস!' বলল ও।

পায়ের ডগায় ভর দিয়ে তাকে হাত চালাল কিশোর। ছোট্ট এক বোতাম খুঁজে পেয়ে টিপে দিল। হঠাৎই এক তাক হড়কে খুলে গেল।

'দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল ও।

'খাইছে, বইগুলো ভুয়া! এটা গোপন খুপরি,' বলল মুসা।

খুপরির মধ্যে ছোট এক টিভি সেট আর ভিসিআর। খুপরিটা খোলাতে গুঞ্জনধ্বনিটা জোরাল হয়েছে। এবার ভিসিআর 'টিক' করে উঠলে শব্দ থেমে গেল।

'রিওয়াইন্ড হচ্ছিল,' মুসা বলল, 'নিশ্চয়ই টেপের শেষে চলে এসেছিল।'

'কিন্তু কী রিওয়াইন্ড করছিল?' কিশোর প্রশ্ন করল।

এবার আবারও টিক করে উঠল ভিসিআর। লাল এক বাতি জ্বলে উঠল, তারপর কাউন্টআপ শুরু হলো—১, ২, ৩...

'খাইছে, ওটা রেকর্ডিং করছে!'

'হিরু চাচা হয়তো নিরাপত্তার জন্য এটা রেখেছেন,' বলল রবিন।

'তুমি মনে হয় ঠিকই বলেছ,' বলল কিশোর। ছাদের

দিকে চোখ বোলাল। 'অফিসের কোথাও নিশ্চয়ই ক্যামেরা আছে।'

'আমরা ভিডিও হয়ে গেছি, তাই না? দেখা দরকার।' বলল রবিন।

'ঠিক বলেছ!' বলল মুসা।

টেপটা রিওয়াইন্ড করে টিভি অন করল কিশোর। প্লে বাটন চাপল। পর্দায় এক ছবি ফুটল। দেখা গেল, ওরা টিভি আর ভিসিআরের সামনে দাঁড়িয়ে।

'খাইছে!'

এবার ছবিটা লাফিয়ে পাল্টে গেল। এখন অফিসটা ফাঁকা আর অন্ধকার। অফিসের দরজা খুলে গেল। জেমস ব্রাউন ঢুকল ভেতরে।

'নিশ্চয়ই আজকে সকালের ছবি,' বলল রবিন। 'জেমস আমাদের আগে এখানে এসেছিল।'

'হয়তো পান্না চুরি করছে সেটা রেকর্ড হয়ে গেছে,' বলল মুসা।

ছবিতে দেখা গেল জেমস বাতিগুলো জ্বালল। এরপর রেইনকোট খুলে নিজের অফিসে গিয়ে ঢুকল।

পরস্পর মুখ তাকাতাকি করল তিন বন্ধু। জেমস বাক্সটার ধারেকাছে যায়নি।

'ফাস্ট ফরওয়ার্ড দাও,' বলল মুসা। 'সামনে কী আছে দেখি।'

কিশোর বাটন টিপতেই শোঁ শোঁ করে সামনে এগোল টেপ। কেঁপে উঠল পর্দার ছবি।

'দেখো!' বলে উঠল রবিন। 'কিছু একটা ঘটছে!'

'কিশোর প্লে বাটন টিপে দিল। টেপটা ধীর হয়ে এল। দেখা গেল হিরু চাচা আর ওরা অফিসে হেঁটে ঢুকছে।

জেমস ব্রাউনের সঙ্গে দেখা হলো ওদের। এবার হিরু চাচা ড. ক্রুককে ঢুকতে দিল। বাক্সটা খোলা হলো আবারও, প্রতিটা প্যাকেজ পরখ করলেন ড. ক্রুক।

'এবার জাগুয়ারটা বাক্স থেকে বের করা হবে,' বলল কিশোর।

'আর ডক্টর বলবেন জিনিসটা নকল,' মুসা যোগ করল।

পর্দার দিকে ইশারা করল রবিন।

'এখানে উনি ফ্ল্যাশলাইট বের করেন।'

'কিশোর আর আমি শেড টেনে বাতি নিভিয়ে দিই,' বলল মুসা।

ছবি কালো হয়ে গেল।

এরপর দেখা গেল ড. ক্রুকের ফ্ল্যাশলাইটের আলো। এবার সেটাও নিভে গেল।

'এ সময় তুমি তার ফ্ল্যাশলাইট খুঁজে দাও,' রবিন বলল মুসাকে।

এক মিনিট বাদে ড. ক্রুক ফ্ল্যাশলাইট হাতে পান্নাটায় আলো ফেলেন।

এবার আলো ফিরে আসে। একটু পরেই উদয় হন সেলিনা হায়েক এবং তারপর পুলিশ আসে। টেপে দেখা যায় সবাই অফিস ত্যাগ করছে।

কিশোর হাত বাড়িয়ে স্টপ বাটন টিপল।

'দাঁড়াও! মিশেল আর সেলিনা হায়েকের ব্যাপারে কী হবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'ও, হ্যাঁ।'

একটুক্ষণ ফাঁকা অফিসটা পরীক্ষা করল ওরা। কিশোর টেপের আগে কী আছে দেখতে যাবে, এ সময় খুলে গেল জেমস ব্রাউনের অফিসের দরজা। মিশেল ভেতরে ঢুকলেন!

'গোপন দরজাটার সঙ্গে মিশেলের কিচেনের যোগাযোগ আছে,' বলল রবিন।

মিশেলকে ওরা সোজা মাছের ট্যাংকের দিকে আসতে দেখল। ওখানে পৌঁছে মাছদের উদ্দেশে চুমুর শব্দ করলেন তিনি। এবার খাবারের প্যাকেট তুলে নিয়ে খানিকটা খাবার ছিটালেন। এরপর ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেলেন।

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তিন বন্ধু।

'মনে হয় উনি চোর নন,' বলল মুসা।

টিভির দিকে ফিরে চাইল রবিন।

'সেলিনা হায়েকের ব্যাপারটা?'

আরও কিছুক্ষণ টেপটা দেখল ওরা, কিন্তু সেলিনা হায়েক এলেন না। শেষমেশ নিজেদেরকে দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখল।

কিশোর টেপটা থামিয়ে রিওয়াইন্ড বাটন চাপল।

'হিরু চাচা পুলিশকে টেপটার কথা বললেন না কেন?' মুসা বলল। 'এটা দেখলে ওরা অন্তত বুঝত জেমস আর মিশেল পান্নাটা চুরি করেনি।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'মিশেল জানতেন না পান্নাটা মাছের ট্যাংকে আছে,' বলল। 'কাজেই বলা যায় জাঁ পিয়েরে ওটাকে ওখানে রাখেননি।' বিষণ্ন দেখাল ওকে। 'আর সেলিনা হায়েক যদি অফিসে না-ই ঢুকে থাকেন...'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রবিন।

'তার মানে—'

'হিরু চাচাই একমাত্র সাসপেক্ট!' বলল কিশোর।

আট

'কিন্তু হিরু চাচা পান্নাটা নিতে পারেন না, কেননা আমরা সর্বক্ষণ তার সঙ্গে ছিলাম। তা ছাড়া টেপেও কিছু দেখা গেল না,' বলল রবিন।

কিশোরের মনটা বিমর্ষ।

'বাতি নিভিয়ে দেওয়ার পর নিতে পারে না?'

'ব্যাপারটা এত কম সময়ের জন্য ছিল যে কীভাবে তাঁর পক্ষে'—বলল রবিন।

'খাইছে! ডেস্কটা দেখো! কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ছে?' হঠাৎই বলে উঠল মুসা।

হিরু চাচার ডেস্কের দিকে চাইল কিশোর আর রবিন।

'কী বলতে চাইছ তুমি? ব্লটার আর লেটার ওপেনার ছাড়া কিছুই তো নেই। এগুলো কালকে আর আজকে সকালেও দেখেছি,' বলল কিশোর।

ভিসিআরের প্লে বাটন দাবাল মুসা। ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে নিয়ে এল, যেখানে রুমটা আর সবাইকে দেখা যাচ্ছে।

'দেখো! লেটার ওপেনারটার ফলা জানালার দিকে তাক করা, তাই না?' বলল মুসা।

'হ্যাঁ, তাতে কী?' কিশোর বলল।

'এক সেকেন্ড অপেক্ষা করো, দেখতে পাবে।'

ছবিতে বাতি নিভে গেছে। ড. ক্রুক ফ্ল্যাশলাইটটা রত্নটার ওপরে ধরার পরে বাতি ফিরল।

'এখন দেখো!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'লেটার ওপেনারটার ফলা জানালার দিকে নেই। ঘুরে গেছে!'

'তাতে কী?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'জানি না, কিন্তু বাতি যখন ছিল না, তখন কেউ একজন লেটার ওপেনারটা তুলে নেয়, এরপর আবার নামিয়ে রাখে,' জানাল মুসা।

'কে সবচেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ছিল?' স্টপ আর রিওয়াইন্ড বাটন চেপে বলল কিশোর।

'মনে হয় ড. ক্রুক,' বলল মুসা। 'তিনি জাগুয়ারের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। লেটার ওপেনারটা ছিল মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।'

‘কিন্তু আঁধারে তার লেটার ওপেনার লাগবে কেন?’ রবিনের প্রশ্ন।

ঠিক এ সময় অফিসের দরজার বাইরে থপথপ শব্দ শোনা গেল। কেউ যেন কার্পেটে পা দাপাচ্ছে।

‘কে ওটা?’ ফিসফিস করে প্রশ্ন করল রবিন।

ঢোঁক গিলল মুসা।

‘খাইছে, দরজাটা বন্ধ নাকি?’

‘মনে হয় না!’ পাল্টা ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর। দেয়ালের সুইচগুলোতে একটা হাত বোলাল ও। মাছের ট্যাংকের ওপর ছোট্ট এক বাতি জ্বলছে শুধু। সারা ঘর অন্ধকার।

‘দেখো!’ বিড়বিড় করে বলল মুসা। দরজার ফ্রস্টেড গ্লাসের জানালা ভেদ করে দীর্ঘ এক ছায়ামূর্তি দেখতে পেল ওরা।

টিক করে শব্দ উঠল, এরপর খুলে গেল দরজা।

‘পালাও! জেমসের অফিসে!’ ফিসফিসে কণ্ঠে জরুরি তাগিদ দিল কিশোর।

ছোট অফিসটায় দৌড়ে ঢুকে পড়ল ছেলেরা। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রেখেছে কিশোর, কে ঢোকে দেখার জন্য।

ড. ক্রুক।

নয়

অন্ধকারাচ্ছন্ন অফিসে পা রাখলেন ড. ক্রুক। হিরু চাচার ডেস্কের উদ্দেশে পা টিপে টিপে এগোচ্ছেন।

হঠাৎই ফ্লাশলাইটের সুইচ জ্বাললেন। ধীরে ধীরে ঘুরে, গোটা ঘরে আলো বোলালেন।

জেমসের অফিসে দেয়ালের গায়ে সেঁটে গেল কিশোর। শ্বাস চেপে রেখেছে। ওর পাশে অনুভব করল, কাঁপছে মুসা আর রবিন।

সাহস করে আবারও উঁকি দিল কিশোর। ফ্লাশলাইটটা এখন ডেস্কের ওপর শোয়ানো। মাছের ট্যাংকে হলদেটে গোল এক রশ্মি ছড়িয়েছে ওটার আলো।

ড. ক্রুক ঝুঁকে পড়ে ট্যাংকটার দিকে চেয়ে।

হঠাৎই গালি দিয়ে উঠলেন। থাবা মেরে ফ্লাশলাইট তুলে নিয়ে উন্মাদের মতো ঘরের চারধারে বোলাচ্ছেন।

কিশোর কাঠপুতুল হয়ে গেল। আবার যখন উঁকি দিল, ড. ক্রুক ফ্লাশলাইটের আলো ফেলেছেন মেঝেতে, পায়ের কাছে।

ঝুঁকে বসে মেঝেতে কী যেন স্পর্শ করলেন।

কিশোরের মনে হলো, রবিনের ফেলা পানির ফোঁটা পরখ করছেন।

অন্ধকার অফিসঘরে আবারও ফ্লাশলাইটের আলো বোলালেন ড. ক্রুক। আলো পড়ল জেমসের দরজায়।

‘কে ওখানে?’ ড. ক্রুক জিজ্ঞেস করলেন।

চোখ বুজে ফেলল কিশোর। শরীর ঠান্ডা হয়ে এসেছে। সভয়ে শ্বাস চাপল রবিন।

এবার পদশব্দ কানে এল কিশোরের। ওদের গুপ্ত জায়গার দিকে এগিয়ে আসছেন ড. ক্রুক!

এখান থেকে পালাতে হবে, ভাবল কিশোর। দেয়ালে হেলান দিল ও, কিন্তু হঠাৎই উধাও হয়ে গেল দেয়াল!

শক্ত এক হাত ওর বাহু চেপে ধরেছে। আরেকটা হাত মুখ চাপা দিয়েছে। যুঝছে, কিশোর অনুভব করল, ওকে পেছন দিকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

‘কথা বোলো না!’ কর্কশ এক কণ্ঠ ফিসফিস করে ওর কানে বলল। ‘এসো আমার সঙ্গে!’

বাধা দেওয়ার শক্তি পেল না আতঙ্কিত কিশোর। হাত বাড়িয়ে মুসা আর রবিনকে খুঁজল, পেল না। ওরা কোথায়?

‘জলদি নেমে পড়ো!’ কণ্ঠটা বলল।

পায়ের নিচে সিঁড়ি। টলতে টলতে নেমে যাচ্ছে, পরিচিত গন্ধ নাকে এল।

সিঁড়ির গোড়ায়, খুলে গেল এক দরজা। আলো দেখতে পেল কিশোর। পেঁয়াজের গন্ধ।

মিশেলের কিচেনে রয়েছে ও!

এবার ওর গায়ে ধাক্কা খেল রবিন আর মুসা। মিশেল ওর বাহু ছেড়ে দিয়ে দড়াম করে দরজাটা লাগিয়ে দিলেন। ওই সরু দরজাটাই আগে ওঁকে বন্ধ করতে দেখেছিল কিশোর।

‘এসো,’ বলে ঠোঁটে একটা আঙুল ছোঁয়ালেন মিশেল।

রেস্তোরাঁর সামনের দিকে ওদেরকে একরকম তাড়িয়ে নিয়ে এলেন তিনি।

‘চোর এখনো ওখানে আছে। বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিই। ও তাহলে আটকা পড়বে,’ বললেন।

এক্সিটের দিকে পড়িমরি এগোলেন কিন্তু দেখা গেল, ড. ক্রুক ইতিমধ্যেই হনহনিয়ে রেস্তোরাঁর জানালার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

‘চলে গেল! ওকে আর ধরা যাবে না!’ হাহাকার করে উঠলেন মিশেল।

‘অসুবিধা নেই। আমরা ওঁকে ভিডিওতে ধরে রেখেছি,’ বলে হাসল কিশোর।

‘ভিডিও? বুঝলাম না!’

‘হিরু চাচার অফিসে গোপন ক্যামেরা আছে,’ ব্যাখ্যা করল ও।

মুসা আর রবিনের দিকে চাইল।

‘লুকানোর আগে রিওয়াইন্ড বাটন টিপেছিলাম, মনে আছে? তার মানে শুরু থেকে আবারও রেকর্ডিং চালু হয়েছে। তারপর তো ড. ক্রুক ঢুকলেন।’

‘শুধু তা-ই নয়, লেটার ওপেনারে ওঁর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে,’ বলে উঠল মুসা।

‘লেটার ওপেনার?’ ওদের দিকে চেয়ে সবিস্ময় বললেন মিশেল।

‘ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি আমি,’ বলে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। ‘বাতি নেভানো হলে উনি লেটার ওপেনার দিয়ে জাগুয়ারের পান্নাটা খসান। তারপর ঝটপট নকল পাথরটা জায়গামতো বসিয়ে আসলটা ফেলে দেন মাছের ট্যাংকে।’

‘কিন্তু ক্যামেরা আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে কী হবে, যদি

> একটুক্ষণ ফাঁকা অফিসটা পরীক্ষা করল ওরা। কিশোর টেপের আগে কী আছে দেখতে যাবে, এ সময় খুলে গেল জেমস ব্রাউনের অফিসের দরজা। মিশেল ভেতরে ঢুকলেন!

পান্নাটাই ওর কাছে থেকে থাকে?' বললেন মিশেল।
'তা নেই!' বলল রবিন। মুঠো খুলে পান্নাটা দেখাল মিশেলকে। 'এটা মাছের ট্যাংকে ছিল। উনি হাত করার আগেই তুলে নিয়েছি!'
'বাহ্, চমৎকার!' বলে রবিনকে জড়িয়ে ধরলেন মিশেল।
'এখন কী করব আমরা?' মুসার প্রশ্ন।
দেয়ালফোনের কাছে হেঁটে গেলেন মিশেল।
'পুলিশ ডাকব!' বললেন।

দশ

জাঁ পিয়েরে পানির গ্লাস তুলে ধরলেন।
'টোস্ট হয়ে যাক,' বললেন।
হিরু চাচা আর মিশেল তাঁদের গ্লাস তুললেন।
'তিনজন দুর্দান্ত সাহসী আর বুদ্ধিমান ছেলের উদ্দেশে!' তিন বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন জাঁ পিয়েরে।
'তোদের জন্যই একটা শয়তান জেলে গেল আর অমূল্য এক রত্ন রক্ষা পেল,' বলল হিরু চাচা।
'তুমি কুকিটার কথা বলাতেই তো সবকিছু খোলাসা হলো,' বলল কিশোর।
মৃদু হাসল হিরু চাচা।
'তোর ওপর আমার বিশ্বাস ছিল। তাই চাবিটা দিয়ে গেছিলাম।'
'রবিনের কুকিতে ছিল, অপ্রত্যাশিত জায়গায় গুপ্তধন পাবে ও। তা-ই পেয়েছে!' বলল মুসা।
'আর মুসা লক্ষ করেছিল লেটার ওপেনারটা সরানো হয়েছে,' বলল রবিন।
'হ্যাঁ। আর কিশোর বইয়ের পেছনে ভিডিও রেকর্ডারটা খুঁজে পেয়েছিল,' বলল মুসা।
মিশেলের দিকে চেয়ে স্মিত হাসল কিশোর।
'ভাগ্যিস আপনি আমাদের উদ্ধার করেছিলেন!'
'তোমাদের আরও কুকি দিতে এসে দেখি তোমরা নেই,' বললেন মিশেল। 'তারপর দেখি ডক্টর লোকটা নিচের দরজার কাছে ছোঁক ছোঁক করছে। তাই পেছনের সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে যাই আমি!'
'আপনাদের এখানে গোপন দরজা কেন?' হিরু চাচাকে প্রশ্ন করল রবিন।
'বহু বছর আগে পোর্টার জাদুঘর ছিল প্রাইভেট বাসা। মিস্টার ও মিসেস পোর্টারের কাজের লোকেরা পেছনের সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করত। এটা জাদুঘর হয়ে গেলে আর্কিটেক্টরা ঠিক করলেন, যেমনকে তেমন রাখবেন,' ব্যাখ্যা করল হিরু চাচা।
'ভাগ্যিস রেখেছিল!' বলল মুসা।
'আমি যখন থাকি না, মিশেল আসে মাছগুলোকে খাবার দিতে,' বলল হিরু চাচা।
মৃদু হাসলেন মিশেল।
'তোমরা ভেবেছিলে আমিই চোর, তাই না?'
লাল হয়ে গেল কিশোরের মুখের চেহারা।
'হ্যাঁ, কিন্তু সেলিনা হায়েককে বিল্ডিংয়ে ঢুকতে দেখে ভেবেছিলাম, কাজটা তাঁরই।'
হেসে উঠল হিরু চাচা।
'ও একটু আগে ফোন করে এর ব্যাখ্যা দিয়েছে। ছাতা ফেলে গিয়েছিল, সেটা নিতে এসেছিল।'
'হিরু চাচা, পুলিশকে তুমি ক্যামেরা আর ভিডিওর কথা বলোনি কেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হা হা করে হেসে উঠল হিরু চাচা।
'ভুলে গিয়েছিলাম। জেমস এটা ইনস্টল করেছে, ওরও মনে ছিল না।'
'একটা কথা বুঝলাম না,' বলল মুসা। 'ড. ক্রুক অত তাড়াতাড়ি নকল পান্নার সঙ্গে আসল পান্না পাল্টাপাল্টি করলেন কীভাবে? তা-ও আবার আঁধারের মধ্যে!' বলল মুসা।
'নিশ্চয়ই বারবার প্র্যাকটিস করেছিল,' বলল হিরু চাচা। 'আর ভেতরে ঢুকে মনে হয় আমার লেটার ওপেনারটা স্পট করেছিল।'
'সে জন্যই উনি চেয়েছিলেন, আমরা যাতে জাগুয়ারটাকে ডেস্কে, মাছের ট্যাংকের কাছে রাখি,' বলল কিশোর। 'আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলেন, পান্নাটা পানিতে ফেলবেন।'
মাথা ঝাঁকাল হিরু চাচা।
'হ্যাঁ, যাতে পরে এসে নিয়ে যেতে পারে।'
'উনি যখন আপনাকে দ্বিতীয় কারও মত নিতে বললেন, তখন নকল পান্নাটা বসানো সারা। আসলটা সরিয়ে ফেলেছেন তিনি,' বলল রবিন।
'ঠিক, আরেকটু হলেই পার পেয়ে যেত লোকটা,' বলল হিরু চাচা। সবার দিকে চেয়ে হাসল। 'কিন্তু ও তো জানে না, তিনটে দুঁদে গোয়েন্দা লুকিয়ে আছে জেমসের অফিসে!'
ঠিক এ সময় রেস্তোরাঁর বাইরে ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল।
'আমাদের রাইড এসে গেছে!' বলে উঠে দাঁড়াল হিরু চাচা।
'কিসের রাইড? আমরা তো হেঁটেই তোমার অ্যাপার্টমেন্টে যেতে পারি,' বলল কিশোর।
'আমরা এক্ষুনি ফিরছি না। আয়!' বলল হিরু চাচা।
সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে এল সে। বাইরে মস্ত বড় এক সাদা ঘোড়া দাঁড়িয়ে। ঘোড়াটা বাগির সঙ্গে জোড়া। হার্নেসের চামড়া জুড়ে ছোট ছোট বাতি আর ঘণ্টা।
খাটো এক লোক নেমে এল চালকের আসন থেকে। পরনে ধূসর স্যুট। মাথায় কালো টপ হ্যাট।
'হ্যালো, আমি আলফি। আর এই সুন্দর ঘোড়াটা হচ্ছে প্রিন্স,' বলল লোকটা।
'উঠে পড়!' বলল হিরু চাচা।
'খাইছে! কোথায় যাচ্ছি আমরা?' বাগিতে উঠে বলল মুসা।
'কে পরোয়া করে,' বলে ওর পাশে বসল নথি।
হিরু চাচা কিশোরকে উঠতে সাহায্য করে ওর পাশে বসল।
'আমরা রাতের নিউইয়র্ক শহর ঘুরে দেখব। ট্রাফিক জ্যাম আর পান্না চোর ছাড়াও যে নিউইয়র্কের সৌন্দর্য আছে, সেটা তোদের জানা দরকার।'
বাগির পেছনে টোকা দিলেন তিনি।
'আমাদের নিয়ে চলো, আলফি!'
'আউ রেভয়া!' সাইডওয়াক থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন জাঁ পিয়েরে আর মিশেল। 'কাল দেখা হবে!'
প্রিন্সের উদ্দেশে জিবে শব্দ করল আলফি, নড়ে উঠল বাগিটা। ধীরে ধীরে রাস্তায় খটাখট শব্দ তুলে রওনা হয়ে গেল।
কিশোর আরাম করে বসে চোখ মেলে দিল আকাশের দিকে। লক্ষ তারা ঝিকমিক করছে। একটা তারা অন্যগুলোর চেয়ে বড়। সবুজ এক রত্নের মতো দেখাচ্ছে ওটাকে।
সবুজ নক্ষত্রটা মিটমিট করে উঠে মিলিয়ে গেল।
হেসে উঠল কিশোর।
'এত হাসি কিসের?' মুসা প্রশ্ন করল।
মাথা ঝাঁকাল কিশোর।
'কিছু নয়, চোখ আবারও আমাকে ধোঁকা দিল।'

অলংকরণ : **আরাফাত করিম**

মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস
আজকের সঞ্চয় আগামীর আত্মবিশ্বাস

মুদারাবা এক্সিম স্টুডেন্ট সেভারস

'আজকের সঞ্চয়, আগামীর আত্মবিশ্বাস'

আজকের শিক্ষার্থীরাই এ দেশের ভবিষ্যৎ চালিকাশক্তি; আগামী দিনে বাংলাদেশের মুখপাত্র। শিক্ষাজীবন থেকেই তাই শিক্ষার্থীদেরকে সঞ্চয়মুখী করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। সঞ্চয়ের এই মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করে স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ জাতি গড়তে এক্সিম ব্যাংক এবার এনেছে দু'টি অনন্য ব্যাংকিং সেবা:

- মুদারাবা স্টুডেন্ট সেভিংস ডিপোজিট একাউন্ট
- মুদারাবা মাসিক স্টুডেন্ট সেভিংস স্কিম

এক্সিম স্কুল ব্যাংকিং এর সুবিধাসমূহ

- আকর্ষণীয় লভ্যাংশ
- কোন সার্ভিস চার্জ নেই
- সর্বনিম্ন জমা ১০০ টাকা
- একাউন্টের মাধ্যমে টিউশন ফি প্রদানের সুবিধা
- ডেবিট কার্ড ও ফ্রি এটিএম সুবিধা

EXIM BANK
শরীয়াহ্ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

যে কোন তথ্যের জন্য ১৬২৪৬

www.eximbankbd.com

ভিনপাড়ার আগন্তুক

নাবিল মুহতাসিম

[বিখ্যাত রহস্যসন্ধানী আর্দশির শাপুর শিপলুর এই কেস স্টাডিটাও বরাবরের মতো ছাপা হয়েছিল মাসিক *হালচাল*-এর নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকের একটা সংখ্যায়। এখানে পুরো ঘটনাটা তুলে দেওয়া হলো]

বাবলুর মানসিক অবস্থাটা কেমন, সেটা টেলিফোনেই ওর স্বর শুনে খানিকটা বোঝা গিয়েছিল। মফস্‌সল শহরটার রেলস্টেশনে যখন নামলাম, প্ল্যাটফর্মে পা দিতেই দেখি বাবলু এগিয়ে এসেছে রিসিভ করতে। উদ্বেগে শুকিয়ে যাওয়া ওর চেহারাটা যেহেতু আগেই আঁচ করেছিলাম, তাই ওর কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, 'বাবলু! কিরে, সব ঠিক তো?'

আপত্তি অগ্রাহ্য করে আমার ব্যাকপ্যাকটা কাঁধে তুলে নিয়ে স্টেশনের দরজার দিকে এগোতে এগোতে বাবলু মনমরা গলায় বলল, 'টেলিফোনে তো আপনাকে খানিকটা বলেছি, ভাই।'

'ঠিক। খানিকটা শুনেছি। এবার পুরোটা বল।'

বাবলু কিন্তু বলল, এখন না, আগে আমি ওদের বাড়িতে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে সকালের নাশতা করব, তারপর। কী আর করা। স্টেশনের বাইরে সকালের ঝলমলে রোদে একটা রিকশায় উঠে পড়লাম আমরা।

বাবলুর পরিচয়টা দেওয়া দরকার। ও কিন্তু বয়সে অনেক ছোট, এবার কলেজে উঠবে। চটপটে এই কিশোর আমার প্যারানরমাল ইনভেস্টিগেশন বা অলৌকিক রহস্য অনুসন্ধানের সবচেয়ে বড় ভক্তদের একজন। ইতিমধ্যেই কয়েকটা কেসে ডেকে এনেছে ওর শহরের আশপাশে। তাই এবার যখন ফোন করল আমাদের পত্রিকা অফিসে, ওর উত্তেজিত কণ্ঠ শুনে রাতের ট্রেনে চেপে চলে আসতে দ্বিধা করিনি।

'তোমার মা-বাবাকে কিন্তু বিরক্ত করছি আমি,' হেসে বললাম আমি। 'এই নিয়ে তিনবার আসছি তোমাদের বাসায়।'

'তিনবার না, চারবার,' শুধরে দিল বাবলু। 'তিনবার কেন, তিন শ বার এলেও ওনারা কিছু মনে করবেন না। প্রায়ই বরং আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "শিপলু ছেলেটা আবার কবে আসবে!"'

মফস্‌সল শহরের সকালের কর্মব্যস্ততার মধ্যে টুং টুং করে এগোচ্ছে আমাদের রিকশা। আলোচনার ছলে বললাম, 'মাসিক *আজকাল*-এ তোমাদের শহর নিয়ে খুব একটা অদ্ভুত খবর বেরিয়েছে এই মাসে। আমি ভাবছিলাম তোমাকে ফোন করব, তোমার চোখে কিছু পড়েছে কি না, সেটা শুনতে।'

মাসিক *আজকাল* আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা। আমাদের মাসিক *হালচাল*-এর গ্রাহকসংখ্যা অনেক বেড়েছে গত দু-তিন বছরে, সেটা হয়তো আমার প্যারানরমাল কেস স্টাডিগুলোর জন্যই অনেকটা। আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাসিক *আজকাল*ও চেষ্টা করে বিচিত্র আর অস্বাভাবিক সব ঘটনার প্রতিবেদন ছাপতে। তবে ওদের এই মাসের একটা প্রতিবেদন বোধ হয় সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে, কীর্তিমারী শহরের আকাশে ইউএফও দেখা গেছে।

'ইউএফও' শব্দটার সঙ্গে তোমরা অনেকেই পরিচিত বোধ হয়। আন-আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্টকে সংক্ষেপে বলে ইউএফও। বাংলায় বলা যায়, 'অজানা উড়ন্ত বস্তু'। আকাশে এমন কিছু উড়তে দেখা, যেটা মানুষের তৈরি বলে মনে হয় না বা অন্য কোনোভাবেও ব্যাখ্যা করা যায় না। প্লেন নয়, রকেট নয়, বেলুন বা ঘুড়িও নয়। বেশির ভাগ সময়ই পিরিচের আকারের হয় জিনিসগুলো বা লম্বাটে ধরনের। আকাশে হঠাৎ উদয় হয়, আবার তীব্র বেগে অদৃশ্যও হয়ে যায়। অনেকে বলে, চোখের ভুল। তবে সবচেয়ে বেশি যে মতবাদটা চালু, সেটা হচ্ছে জিনিসগুলো ভিনগ্রহবাসীর মহাকাশযান। মানুষের চেয়ে অনেক গুণ উন্নত অতি বুদ্ধিমান এলিয়েনরা ওসব যানে করে এসে আমাদের ওপর নজর রাখে।

আমাকে অবাক করে দিয়ে ইউএফও নিয়ে বেশি আগ্রহ দেখাল না বাবলু। খালি বলল, 'প্রতিবেদনটা দেখেছি ভাই। ইউএফওর মতো একটা জিনিসও দেখেছি নিজের চোখে। কিন্তু...আমাদের পাড়ায় যেটা হয়ে চলেছে, সেটা বোধ হয় আরও বেশি অদ্ভুত।'

রিকশা ততক্ষণে মোড় নিয়ে বাবলুদের পাড়ায় ঢুকে পড়েছে।

বাবলুর মা-বাবা রীতিমতো লজ্জায় ফেলে দিলেন আমাকে আপ্যায়ন করে। সাজানো-গোছানো একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন আমার জন্য। সেখানে মালপত্র রেখে হাতমুখ ধুয়ে খাবার টেবিলে বসতেই বিরাট আয়োজন। খেয়ে কূল পাচ্ছি না।

বাবলুর বাবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মা স্কুল টিচার। আজ ছুটির দিন হওয়ায় দুজনই বাসায়। সদালাপী এই দম্পতির সঙ্গে খোশগল্প করলাম অনেকক্ষণ।

গোঁফের নিচে মুচকি হাসি ফুটিয়ে বাবলুর বাবা বললেন, 'তো শিপলু সাহেব! হঠাৎ কীর্তিমারীতে আগমন যে! যেমন ব্যস্ত সাংবাদিক তুমি, কোনো কাজ ছাড়া আসার কথা নয়।'

হেসে বললাম, 'একটা রহস্যের সন্ধান পেয়েছি বটে। তবে সেটা এ মুহূর্তে আমার চেয়ে ভালো জানে বাবলু।'

সবাই বাবলুর দিকে তাকালেন। অপ্রস্তুত বাবলু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ওই যে ইউএফওর ব্যাপারটা!'

'হ্যাঁ,' বাবলুর মা বললেন। 'এমনকি আমরাও দেখেছি একদিন।'

ব্যাপারটা খুলে বললেন বাবলুর মা। রাত আটটার দিকে একদিন বাইরে কিসের শোরগোল শুনে বেরিয়ে দেখেন, সবাই আকাশের দিকে আঙুল তুলে কী যেন বলাবলি করছে। তিনি, বাবলুর বাবা আর বাবলু তখন ছাদে যান এবং পরিষ্কার দেখেন, তিনটা আলো উড়ে বেড়াচ্ছে রাতের আকাশের গায়ে। প্রথমে আলোগুলোকে আলাদা মনে করেছিলেন ওনারা। একটু পরই বোঝা গেল, একটার সঙ্গে আরেকটার সম্পর্ক আছে। তারাভরা আকাশের বিপরীতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল চাকতির মতো একটা বিরাট উড়ন্ত যানের আকার। আলোগুলো সেটার নিচ থেকে বেরোচ্ছিল।

'অনেকটা একটা গাড়ির হেডলাইটের মতো,' বাবলুর বাবা বললেন। 'কিন্তু বহুগুণ উজ্জ্বল। খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক উড়ে হঠাৎ তীব্রবেগে সোজা ওপরের দিকে উঠে হারিয়ে গেল জিনিসটা।'

'এত দ্রুত কোনো প্লেন বা হেলিকপ্টার উড়তে পারে না,' বাবলুর মা মন্তব্য করলেন। 'তা ছাড়া ইঞ্জিনের কোনো শব্দ ছিল না।'

বাবলু কিন্তু চুপ মেরে আছে, অন্যমনস্ক চেহারা। আন্দাজ করলাম, যে ঘটনার জন্য আমাকে ও ডেকে এনেছে, সেটা না বলতে পেরে শান্তি পাচ্ছে না। চা শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আন্টি, অনেক আয়োজন করেছেন। ধন্যবাদ। এবারে—'

'এবারে রুমে গিয়ে বিশ্রাম নাও, বাবা। অনেক দূরের পথ এসেছ,' হেসে বললেন আন্টি।

ঘরে চলে এলাম, আমার পেছন পেছন এল বাবলু।

'ট্রেনে অনেক ঘুমিয়েছি,' একটা চেয়ারে বসে বললাম আমি। 'এবার বিস্তারিত বলো তো, ফোনে যেটা বলছিলে।'

'এই পাড়ায় অদ্ভুত কিছু ঘটে চলেছে, শিপলু ভাই,' বলল বাবলু। 'এবং সেটা শুধু ইউএফও নয়।'

সপ্তাহ দুয়েক আগের কথা। বাবলু খেয়াল করে, ওর বন্ধু নয়ন কলেজে আসছে না দুদিন ধরে। প্রথমে কিছু মনে করেনি ও, কিন্তু কেমিস্ট্রি স্যারের প্রাইভেট ব্যাচেও যখন পেল না নয়নকে, তখন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। অন্য ক্লাসমেটরাও কিছু জানে না। এমনটা হতেই পারে যে নয়ন অসুস্থ বা কোথাও বেড়াতে গেছে সপরিবার। তবে সে ক্ষেত্রে বাবলুকে একটা ফোন তো অন্তত করবে সে। বাবলু ঠিক করল, নয়নের বাড়িতে যাবে। একই পাড়ায় বাড়ি নয়নদের, দুটো রোড পরে।

নয়নদের বাড়িতে গিয়ে দরজায় কলবেল টিপতেই যা দেরি, বেরিয়ে এল নয়ন। সুস্থ-স্বাভাবিক আর চিরকালের মতোই হাসিখুশি।

'একটু বেশিই হাসিখুশি,' বলতে গিয়ে গলা কেঁপে উঠল বাবলুর।

নয়ন বাবলুকে বাসার ভেতরে নিয়ে রুমে বসিয়েছিল। দুদিন ধরে খোঁজ নেই কেন, নিজেই বলেছিল সেটা। ওরা সপরিবার আত্মীয়ের বাসায় গিয়েছিল, পাশের জেলা রংপুরে। কথাটা শুনেই খটকা লেগেছিল বাবলুর। নয়নের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বটা এমন যে সবকিছুই শেয়ার করে। দুদিনের জন্য ক্লাস বাদ দিয়ে ঘুরতে যাবে, সেটা আগের দিন অবশ্যই বলার কথা বাবলুকে।

আরও খানিকক্ষণ ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার ইচ্ছা ছিল বাবলুর, কিন্তু ততক্ষণে গা ছমছম করতে শুরু করেছিল ওর। নয়নের মুখে একটা হাসি লেগেই ছিল, কথা বলতে বলতেও হাসছিল সে। দাঁতের পাটি বের করা হাসি। সেই সঙ্গে স্থির তাকিয়ে ছিল নয়নের দিকে, একমুহূর্তের জন্যও অন্যদিকে তাকাচ্ছিল না।

কিছু একটা কারণ দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে চাচ্ছিল বাবলু। বেরিয়ে এসেছিল নয়নের রুম থেকে, তারপর বসার ঘর আর ডাইনিং রুম পেরিয়ে বাইরে চলে আসত। নয়নের মা তখনই ডেকেছিলেন ওকে, 'বাবলু, কেমন আছ বাবা? বিকেলবেলা এসেছ, নাশতা খেয়ে যাও।'

নয়নদের বাসায় গেলেই কিছু না খাইয়ে ছাড়েন না ওর মা। কিন্তু ওনার দিকে তাকাতেই অন্তরাত্মা শিউরে উঠেছিল বাবলুর। সেই একইভাবে হাসছিলেন নয়নের মা, একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে। ঠিক নয়নের মতো। অভদ্রতা হয়ে যাবে জেনেও আর থাকতে পারেনি বাবলু, কিছু একটা কারণ দেখিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে।

পরদিন ক্লাসে এসেছিল নয়ন। বাবলু প্রায় নিশ্চিত ছিল যে ওভাবে চলে আসার জন্য ধমক দেবে সে, কিন্তু নয়ন নাকি কিছুই বলেনি। মুখে লেগে ছিল সেই হাসি, ক্লাসের এক কোনায় বসে প্রতিটা ক্লাসের পাতার পর পাতা নোট নিচ্ছিল। অস্বাভাবিক দ্রুত কলম চলছিল তার, স্যারদের মুখের একটা কথাও যেন মিস করবে না।

'এমন না যে নয়ন কখনো অমনোযোগী ছিল ক্লাসে,' বলল বাবলু, 'কিন্তু এমন আচরণ করতেও কখনো দেখিনি ওকে।'

শুধু এটুকু হলেও মেনে নেওয়া যেত। পরদিন সকালে হাঁটতে বেরিয়ে আরেকটা অদ্ভুত ঘটনা দেখেছিল বাবলু। ওদের রোডেই কয়েক বাসা পরে থাকেন এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, জলিল সাহেব। অমায়িক ভদ্রলোক। সকাল-বিকেল তিনিও হাঁটতে বের হন আর বাবলুকে দেখলেই হাসিমুখে কথা বলেন। কিন্তু সেদিন ওনার দিকে তাকিয়েই পিলে চমকে উঠেছিল বাবলুর। বিরাট একটা দেঁতো হাসি ঝুলছিল ওনার মুখে, ঠিক নয়নেরই মতোই! একইভাবে একদৃষ্টে তাকিয়েও ছিলেন বাবলুর দিকে।

বাবলুকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিলেন তিনি, 'আচ্ছা বাবলু, তোমার বাবা তো ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ইঞ্জিনিয়ার, তা-ই না?' অথচ বাবলুর জন্মের আগে থেকেই ওর বাবাকে চেনেন তিনি।

এসব ঘটনা তবু উড়িয়ে দিতে পারত বাবলু। কিন্তু পরের কয়েকটা দিনে ও নিশ্চিত হলো, কোনো একটা গড়বড় সত্যিই হয়েছে।

ওদের পাড়ারই আরেক মাথায় বাসা ডাক্তার রুহুল চাচার। বাসার সঙ্গেই চেম্বার, ফার্মেসি। ওনার কাছ থেকে আব্বুর ব্লাড প্রেশারের ওষুধ আনে বাবলু প্রতি মাসে। সেদিন গিয়ে দেখে, রুহুল চাচা নিজের চেম্বারে বসে পাগলের মতো ডাক্তারি বই পড়ছেন। পড়ার ভঙ্গিটা অস্বাভাবিক। প্রতি সেকেন্ডে একটা করে পাতা ওলটাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু সেটা নয়, বাবলুর হাত-পা জমে গিয়েছিল আরেকটা জিনিস দেখে।

একটা দেঁতো হাসি হাসছেন ডাক্তার চাচা।

'আরও অন্তত তিনজনের ও রকম অবস্থা দেখেছি

'ফ্যান্টাস্টিক!' জলিল সাহেব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। 'আপনার গত মাসের কেস স্টাডিটা পড়েছি। দারুণ! কিছু মনে করবেন না, আমার বাসায় এককাপ চা খেয়ে যেতে হবে

আমি গত কয়েক দিনে,' কাঁপা গলায় বলল বাবলু। 'তখন নিশ্চিত হই, খুবই অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে এই পাড়ায়। কারণ, সবাই এই পাড়ার বাসিন্দা।' বাবলু ব্যাখ্যা করল, কীভাবে পাশের দুটো পাড়ায় ঘুরে ওর মনে হয়েছে ওই অদ্ভুত আচরণ আর কেউ করছে না।

বিচিত্র সমস্যা! খানিকক্ষণ গভীর চিন্তায় ডুবে রইলাম আমি। ওই হাসির কারণ কী? কোনো রোগ? কিছু কিছু রোগে মানুষের মুখ হাসির মতো বেঁকে যায় বটে। যেমন টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার। কিন্তু তাতে তো কেবল হাসিটাই না, অন্য উপসর্গও থাকে। এই লোকগুলোর আচরণ শুনে মনে হলো, অসুস্থতার সেই লক্ষণগুলো তাদের মধ্যে ছিল না।

বাবলুকে বললাম, 'চলো। তোমাদের পাড়ায় একটা চক্কর দিয়ে আসি।'

***

বাবলুদের পাড়াটা ছিমছাম, সুন্দর। ছোট ছোট একতলা-দোতলা বাড়ি। গাছগাছালিতে ভরা। নিঝুম একটা শান্তির ভাব জায়গাটায়।

বাবলু আমাকে দেখাচ্ছে, কোন কোন বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে অদ্ভুত আচরণ দেখেছে ও। নয়নদের বাসা, ডাক্তার রুহুল চাচার বাসা দেখলাম। আরও তিনটা বাসা। বাবলুর সাবেক স্কুলে পড়া একটা মেয়ের বাসা, পাড়ায় নতুন আসা এক শিক্ষক দম্পতির বাসা, বাবলুর আরেক বন্ধু তন্ময়ের বাসাও দেখলাম।

‘আচ্ছা,’ গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা মনে পড়ল আমার, ‘তুমি কি এই সব বাসার সবার মধ্যেই ও রকম আচরণ দেখেছ? না শুধু দু-একজনের ভেতর?’

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বাবলু। ‘নয়নদের ব্যাপারটাই বলি আগে। ওর বাসায় আবার গিয়েছিলাম আমি। ওর বাবার সঙ্গেও দেখা হয়। আঙ্কেলও ওভাবেই হাসছিলেন, আর তাকিয়ে ছিলেন।’

‘তার মানে নয়নদের বাসার সবাই আক্রান্ত হয়েছে ওটাতে।’ আমি বললাম।

‘হ্যাঁ। কিন্তু, অন্য বাসাগুলোয় আমার তেমন যাতায়াত নেই। এক-দুজনকে ও রকম করতে দেখেছি, পরিবারের বাকিদের ব্যাপারে জানি না।’ বাবলু বলল।

‘এটা বের করার চেষ্টা করতে হবে।’ বললাম আমি। পাড়ার দূর প্রান্ত থেকে আবার বাবলুদের বাসার দিকে ফিরছি আমরা। ও আমাকে ডেকে এনে ভুল করেনি, রহস্যটা আসলেই জমজমাট। ছুটির দিনের এই ঝকঝকে সকাল দশটায়ও পাড়াটা কেমন নিস্তব্ধ। একটু আগে যেটাকে শান্তির ভাব ভেবেছিলাম, এখন সেটাতেই কেমন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে আমার। অতিলৌকিক একটা রহস্য যে ছেয়ে আছে এই পাড়ায়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

একটা জিনিস চোখে পড়ল আমার। ‘আচ্ছা বাবলু, তোমাদের পাড়াটা এমন লম্বা কেন? দৈর্ঘ্যে বেশি, প্রস্থে অনেক কম!’

একটা দিকে আঙুল তুলে দেখাল বাবলু। ‘ওই যে, ওই দিকে ক্যান্টনমেন্ট। কীর্তিমারী সেনানিবাস। ওটার প্রাচীর ঘেঁষে আমাদের পাড়াটা।’

তথ্যটা টুকে রাখলাম মাথায়।

বাবলুদের বাসার কাছাকাছি এসে খেয়াল করলাম, রাস্তার পাশে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এক ভদ্রলোক। বাসাটা একটু আগেই আমাকে দেখিয়েছে বাবলু, অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল জলিল সাহেবের বাসা।

বাবলুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখি, ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে বেচারা। কিন্তু সামনে তো এগোতেই হবে। তা ছাড়া ভদ্রলোক তাকিয়ে আছেন এদিকেই। চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখে চশমা, পরনে ফতুয়া আর প্যান্ট।

আশচর্যের বিষয়, ভদ্রলোকের চেহারা স্বাভাবিক। কোনো হাসির ছাপ নেই সেখানে।

কাছাকাছি এসে কাঁপা গলায় ভদ্রলোককে সালাম দিল বাবলু। ‘আ-আঙ্কেল, ভালো আছেন?’

‘আছি, বাবলু। তোমার সঙ্গে এই তরুণ ভদ্রলোক কে? চেনা চেনা লাগছে।’ ভদ্রলোকের আচরণ, চাউনি দিব্যি স্বাভাবিক।

‘আমার নাম শিপলু। সাংবাদিক। মাসিক *হালচাল* পত্রিকায় আমার রহস্য সন্ধানের কাহিনি প্রকাশিত হয় নিয়মিত।’ বাবলু কিছু বলার আগেই উত্তর দিলাম আমি।

‘ফ্যান্টাস্টিক!’ জলিল সাহেব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। ‘আপনার গত মাসের কেস স্টাডিটা পড়েছি। দারুণ! কিছু মনে করবেন না, আমার বাসায় এককাপ চা খেয়ে যেতে হবে। বাবলু, তোমাকে একটা বই পড়তে দেব ভেবেছিলাম। সেটাও নেবে। চলে এসো।’

দেখলাম, সাদা হয়ে গেছে বাবলুর চেহারা। আমার কাছে কিন্তু ভদ্রলোকের আমন্ত্রণটা সোনায় সোহাগা। বললাম, ‘অবশ্যই। এই পাড়ায় নাকি ইউএফও দেখা গেছে। আপনার চোখে পড়ে থাকলে, সেটাও শোনা যাবে।’

ভদ্রলোকের পেছন পেছন ঢুকে পড়লাম ওনার বাসায়। বাবলুর চেহারা দেখে মনে হলো, বাঘের গুহায় ঢুকছে। তবে ভদ্রলোকের মুখে কোনো অদ্ভুতুড়ে হাসি নেই আর কথাবার্তাও দিব্যি স্বাভাবিকভাবে বলছেন, তাই ওর ভয়টা একটু কমেছে।

জলিল সাহেবের স্ত্রী আমাদের খুব আদর করে কেক আর চা খাওয়ালেন। জলিল সাহেব চাকরিজীবনের অনেক গল্প করলেন। নানা দেশে ঘুরেছেন মিশনে। কথায় কথায় ইউএফওর প্রসঙ্গ এল। ‘আমার ধারণা, ওগুলোর অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে। ভিনগ্রহবাসীরা যদি কষ্ট করে পৃথিবীতে আসেই, তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে যাবে কেন? উদ্দেশ্যটা কী?’ খুবই যুক্তিপূর্ণ কথা।

আরেক দিন এসে দুপুরের খাবার খাব, এই কথা আদায় করে আমাদের ছাড়লেন ওনারা। দরজা পর্যন্ত এগিয়েও দিলেন। বাসাটা থেকে খানিকটা এগিয়ে আসার পর চাপা গলায় বাবলু বলল, ‘শিপলু ভাই, একবার পেছনে তাকিয়ে দেখুন।’

আলতো করে তাকালাম। জলিল সাহেব আর তাঁর স্ত্রী দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন এখনো। স্থির তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে, এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত চওড়া একটা হাসি লেগে আছে মুখে। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত নেমে গেল আমার।

‘দেখলেন, ভাই?’ কাঁপা গলায় বলল বাবলু।

‘দেখেছি।’ বললাম আমি। ‘আমাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হবে বাবলু। খুব অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে তোমাদের পাড়ায়।’

***

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে।

বিকেলের চা-নাশতা খেলাম বাবলুর মা-বাবার সঙ্গে। ওনাদের কিন্তু ধারণা, আমি ইউএফওর ব্যাপারেই তদন্ত করতে এসেছি। তাঁদের পাড়া যে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে খুব বিচিত্র কিছু পড়শি দ্বারা, সেটা জানিয়ে তাঁদের অযথা আতঙ্কিত করলাম না। ব্যাপারটা আগে নিজে বোঝার চেষ্টা করি, তারপর নাহয় সতর্ক করব।

তবে খুব সাবধানে একবার তুললাম প্রসঙ্গটা। ‘আচ্ছা আঙ্কেল, পাড়ার বাসিন্দাদের প্রতিক্রিয়া কি ইউএফও দেখে?’ আসলে জানতে চাচ্ছি, কারও আচরণ অস্বাভাবিক লেগেছে নাকি তাঁর কাছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আঙ্কেল বললেন, ‘আসলে সবাই একটু চিন্তিত। এসব কি খারাপ কিছুর লক্ষণ কি না, সেটা বলছে অনেকে। তা ছাড়া শহরের অন্য কোথাও কেন দেখা যাচ্ছে না, সেটাও কেউ বুঝতে পারছে না।’ এর বেশি কিছু বললেন না তিনি। তার মানে তাঁর চোখে ধরা পড়েনি কিছু।

ঘরে ফিরে বাবলুকে বললাম, ‘যতটুকু শুনলাম, তাতে মনে হচ্ছে আজ রাতে ইউএফও দেখা যেতে পারে। সাধারণত দু-তিন রাত পরপর আসে ওরা, আর শেষ এসেছিল দুই রাত আগে। তার আগে চলো, পাড়ায় আরেকটু ঘুরে আসি।’

বেরিয়ে পড়লাম আমরা। পশ্চিম আকাশে লালচে আভা মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো জ্বলে উঠেছে টিমটিমে হলুদ আলো নিয়ে। একঝলক বাতাস বয়ে গেল।

কয়েক পা হেঁটে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। ‘আশ্চর্য! একটু বেশি নীরব লাগছে না পাড়াটা? কোথাও কোনো শব্দ নেই, কোনো মানুষজন নেই কোথাও, টিভি বা রেডিওর আওয়াজও পাচ্ছি না।’

বাবলুর মুখ থমথম করছে। 'খুবই অস্বাভাবিক, শিপলু ভাই। এই সময় গমগম করার কথা পাড়াটা। মানুষজন বাইরে হেঁটে বেড়ায়, ছেলেমেয়েরা খেলার মাঠ থেকে ফেরে, বাসাবাড়ি থেকে গানের আওয়াজ পাওয়া যায়।'

পাড়ার ও-মাথার দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। দু-চারটা ছোট দোকান যেগুলো ছিল, প্রতিটাই বন্ধ। অথচ সব কটা বাড়িতে আলো জ্বলছে। বোঝা যাচ্ছে যে ভেতরে বাসিন্দারা আছে।

'পাড়াটা এ রকম নীরব হতে শুরু করেছে কবে থেকে, বাবলু?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ইউএফওগুলো দেখা যেতে শুরু করার পর থেকেই,' বাবলু বলল। 'একটু একটু করে শুরু, এখন দেখছি বাইরে বের হওয়া পুরোপুরি বন্ধই করে দিয়েছে সবাই।'

মনে কিসের একটা খটকা টের পাচ্ছি আমি। কী যেন একটা ধরা দেবে-দেবে করেও দিচ্ছে না।

পাড়ার শেষ মাথায় চলে এসেছি আমরা। দূরে আরেকটা পাড়ায় কিন্তু ঠিকই আলো ঝলমল করছে, মানুষজনের হাঁকডাকও শোনা যাচ্ছে। গা শিউরে উঠল আমার।

একটা জিনিস চোখে পড়েছে আমার। একটামাত্র দোকান খোলা দেখতে পাচ্ছি। একটা ফার্মেসি। কাউন্টারের ওপাশে কিন্তু বিক্রেতা নেই। দোকানের আলোও নেভানো, কিন্তু পেছনের অংশে ডাক্তারের চেম্বারে আলো জ্বলছে। একটা সাইনবোর্ডও দেখা যাচ্ছে—ডা. রুহুল আমিন, এমবিবিএস।

'এটাই তোমার ডাক্তার চাচার চেম্বার, তা-ই না বাবলু? এনার কথাই বলেছিলে?'

'হ্যাঁ, শিপলু ভাই,' বাবলু বলল। বারবার আকাশের দিকে তাকাচ্ছে ও। অমাবস্যার অন্ধকার আকাশ, তারা ছাড়া দেখার কিছু নেই। 'আমাদের মনে হয় বাসায় ফেরা উচিত...'

'ফিরব। একবার শুধু কথা বলে নিই ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে।' বলে ফার্মেসি পেরিয়ে ডাক্তারের চেম্বারের দিকে এগোলাম। দ্বিধাভরা পায়ে আমাকে অনুসরণ করল বাবলু।

'আসতে পারি, ডাক্তার সাহেব?' পর্দার এপাশ থেকে বললাম। ওদিকে বইয়ের পাতা ওলটানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

আদৌ কোনো সাড়া পাব, ভাবিনি। দিব্যি স্বাভাবিক একটা কণ্ঠ বলল, 'আসুন।'

ভেতরে গেলাম আমি আর বাবলু। টাক মাথা, চশমা পরা ডাক্তার সাহেব চেয়ারে বসে আছেন। একটা মোটা অ্যানাটমির বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছেন। বাবলুকে দেখে হাসলেন। স্বাভাবিক হাসি, কিন্তু মুখে জমে থাকা এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত হাসি নয়। 'কী খবর বাবলু? সেদিন যে ওষুধ না নিয়েই চলে গেলে?'

বাবলু আমতা আমতা করে কিছু একটা বলল। নিজের পরিচয় দিয়ে আমি সহজভাবে বললাম, 'আপনাদের পাড়ায় ঘুরতে এসেছি, ডাক্তার সাহেব। এমনিই একটু সৌজন্য বিনিময় করতে এলাম আপনার কাছে।'

'আচ্ছা। খুব ভালো লাগল।' আবারও স্বাভাবিক হেসে বললেন ডাক্তার সাহেব। বইয়ের পাতা কিন্তু এখনো ওলটাচ্ছেন একটা একটা করে।

'এই পাড়ায় কি নতুন কোনো অসুখ দেখা দিয়েছে?' প্রশ্ন করলাম আমি। 'মানুষজন অস্বাভাবিক আচরণ করছে, এমন কিছু?'

'কই, না তো!' বিস্মিত হলেন ডাক্তার। 'বরং আমি বলব, এই পাড়ার বাসিন্দারা এখন যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি সুস্থ।'

শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল আমার। 'ত...তা-ই কী?'

'একদম। এই দেখুন, মানুষের শারীরিক গঠন শিখছি।' হাতের বিরাট বইটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। একজন ডাক্তার মানুষের শরীরের গঠন শিখছেন মানে! 'খুবই দুর্বল গড়ন। আবহাওয়ার চাপ-তাপ একটু কমবেশি হলেই, একটু আঘাত লাগলেই মানুষ কাহিল হয়ে পড়ে। কিন্তু এই পাড়ার বাসিন্দারা আলাদা। ওরা এসব ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত হয়েছে।' হাসছেন ডাক্তার সাহেব। একটু বেশিই বড় লাগছে না হাসিটা? এ-কান থেকে চলে গেছে ও-কানে?

আমি ততক্ষণে কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়েছি। 'আ-আমি আসছি,' বলে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এলাম। বাবলু তো চেম্বারের বাইরে এক পা দিয়েই ছিল।

বাইরে এখন ঘুটঘুটে আঁধার। ল্যাম্পপোস্টের বাতিগুলোও নিভে গেছে কেন কে জানে। মাথার ওপর তারাভরা আকাশের বিশাল চাঁদোয়া। কিন্তু...আকাশের ওই কোণে জমাটবাঁধা অন্ধকার কেন? মেঘ জমেছে?

'দ্রুত। বাসায় ফিরে তোমার মা-বাবাকে নিয়ে এই পাড়ার বাইরে কোথাও চলে যেতে হবে।' হনহন করে পা চালাতে চালাতে বললাম আমি।

'শিপলু ভাই, আমাদের পাড়ায় কী হচ্ছে আসলে?' কাঁপা গলায় বলল বাবলু।

'আমি কেবল আন্দাজ করতে পারি, বাবলু।' বললাম আমি। দুশ্চিন্তায় কুঁকড়ে যাচ্ছে মনটা। 'মানবজাতির অনেক দিনের ভয়, ভিনগ্রহবাসীরা এসে দখল করে নেবে পৃথিবী। তা-ই না?'

'হ্যাঁ।' বাবলু প্রায় দৌড়াচ্ছে আমার পাশে। তারার আলোয় কোনোমতে পথ চিনে বাবলুদের বাসার দিকে এগোচ্ছি আমরা।

'কিন্তু ভেবে দেখো, সরাসরি এসে যুদ্ধ করে পৃথিবী দখল করার চেষ্টা করবে না কোনো অতি বুদ্ধিমান এলিয়েন। কারণ, মানবজাতি তো ছেড়ে দেবে না, পাল্টা লড়বে। আমাদেরও পারমাণবিক বোমা আছে। ভিনগ্রহবাসীদের ক্ষয়ক্ষতি হবে ব্যাপক, পৃথিবীটাও অর্ধেক ধ্বংস হবে। দখল করে লাভ হবে না খুব একটা। তাই, অনেকে ধারণা করেন, ভিনগ্রহবাসীরা আসবে খুব গোপনে। এমনভাবে পৃথিবীটা দখল করতে শুরু করবে যে কেউ টেরই পাবে না। শুধু মাঝেমধ্যে আকাশে দু-একটা ইউএফও দেখা যাবে, এ-ই যা। তাঁদের মতে, পৃথিবীটা ইতিমধ্যেই দখল করতে শুরু করেছে ভিনগ্রহবাসীরা!'

'ধরুন, তা-ই করছে তারা। কিন্তু আমাদের পাড়াতেই কেন? ঢাকা শহরে কেন নয়? লন্ডন, নিউইয়র্কে কেন নয়?' হাহাকার করে উঠল বাবলু।

'সেসব জায়গায় বেশি মানুষের চোখে পড়ার সম্ভাবনা। মফস্‌সল শহরের ছোট পাড়ায় সে ভয় নেই। তোমাদের পাড়ার পাশেই কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট, মানুষের সামরিক ক্ষমতার আন্দাজ পাওয়ার জন্য দরকারি। তা ছাড়া তোমাদের পাড়ায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পেশার সবাই আছেন কমবেশি। মানুষের জ্ঞানভান্ডার থেকে তথ্য পাওয়ার জন্য তাদের খুব

প্রয়োজন হবে ভিনগ্রহবাসীদের।'

'আমার বাবা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার,' কোনোমতে বলে এবার দৌড়াতে শুরু করল বাবলু।

বাবলুদের বাসার কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল জিনিসটা। তারাভরা আকাশের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে বিরাট একটা ওলটানো পিরিচের মতো অবয়ব। ফ্লাইং সসার! নিচে জ্বলছে তিনটা উজ্জ্বল আলো।

ফ্লাইং সসারটা স্থির হয়ে ভাসছে বাবলুদের বাসার ঠিক ওপরে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাবলু। আমি নিজেও। আর যেন নড়ার শক্তি নেই কারও।

'পাড়ার মানুষের এ রকম পরিবর্তন হলো কেন, শিপলু ভাই?' ফিসফিস করে শেষ প্রশ্নটা করল বাবলু।

'কারণ, ওরা আর মানুষ নেই।' নিচু গলায় বললাম আমি। 'মানুষদের ধরে নিয়ে গেছে ভিনগ্রহবাসীরা, তার জায়গায় বসিয়েছে তাদের বানানো নকল মানুষ। শুনলে না, ডাক্তার সাহেব...নকল ডাক্তার সাহেব কী বললেন? প্রথম প্রথম তাদের একটু কষ্ট হয়েছে মানুষের আচরণ নকল করতে, তারপর শিখে গেছে। হাসি মুছে গেছে, কথাবার্তা স্বাভাবিক হয়েছে। নকল মানুষদের দিয়ে হয়তো একসময় পৃথিবী ভরিয়ে ফেলবে তারা, পুরো গ্রহ দখল করে নেবে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই।'

'তাহলে কী...' কথাটা শেষ করতে পারল না বাবলু, একটা আঙুল তাক করে রেখেছে ইউএফওটার দিকে।

'হ্যাঁ। ইউএফওটা একটা বাড়ির ওপর স্থির হয়, তারপর বাসিন্দাদের তুলে নেয়। সেই জায়গায় নামিয়ে দেয় নকল মানুষদের।'

আমার কথা শেষ হতে না হতেই একটা হলদে আলোর স্তম্ভ নেমে এল ইউএফওর নিচ থেকে, ছেয়ে ফেলল বাবলুদের পুরো বাড়িটাকে।

'না! আমার মা-বাবা রয়েছেন ভেতরে!' আর্তনাদ করে উঠে বাড়ির দিকে দৌড়ে গেল বাবলু।

'বাবলু, যেয়ো না...' সাবধান করতে চাইলাম আমি, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

সেই হলদে আলোয় সোজা ওপরের দিকে ভেসে যেতে দেখলাম বাবলুর বাবাকে। চোখের পলকে ইউএফওর ভেতর অদৃশ্য হলেন তিনি। একমুহূর্ত পর একইভাবে ওপরে উঠে গেলেন বাবলুর মা। মিলিয়ে গেলেন তিনিও!

বাবলু বাসার কাছাকাছি চলে গেছে ততক্ষণে। হলুদ আলোর বৃত্তে ঢুকতেই যত দেরি, এক সেকেন্ড পরই শাঁ করে ওপরে উঠে গেল সে-ও, হারিয়ে গেল ইউএফওর ভেতর।

আলোর স্তম্ভটা খানিকক্ষণের জন্য অদৃশ্য হলো, তারপর উদয় হলো আবার। দেখলাম, ইউএফও থেকে ভাসতে ভাসতে বাসার দিকে নামছেন বাবলুর মা, বাবা, তারপর বাবলু নিজেও।

মুহূর্তের ভেতর নিভে গেল আলোটা। তারপর ইউএফওটা অবিশ্বাস্য গতিতে সোজা ওপরে উঠে হারিয়ে গেল তারাভরা আকাশে। স্ট্রিট ল্যাম্পগুলো জ্বলে উঠল সব।

আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করেছি। এই পাড়া থেকে পালাতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

যদিও জানি, বাবলুদের বাসার দরজায় কড়া নাড়লে দরজা খুলবে বাবলু নিজেই। ওর মা-বাবাও হাজির হবেন আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

সমস্যা একটাই, হাড় হিম করা একটা দেঁতো হাসি লটকে থাকবে সবার মুখে!

অলংকরণ : **এস এম রাকিব**

কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণে বিশেষ পাউডার

বাতাসের কার্বন শোষণের জন্য প্রাকৃতিক উপায় আছে। গাছ, পানি, সমুদ্রের ইকোসিস্টেম বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড সরিয়ে ফেলার কাজ করে। কৃত্রিমভাবে বাতাস থেকে কার্বন সরানোর জন্য অনেক দিন ধরেই বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা কাজ করছেন। কিছু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলো বাতাস থেকে কার্বন শোষণ করতে পারে। এমন একটি স্ফটিক যৌগ এবার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বেশি হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করেছে।

বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড সরাতে বড় বড় যন্ত্র তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রযুক্তি অনেক শক্তি ও অর্থ ব্যয় করে। প্রতি মেট্রিক টন কার্বন ধরে রাখার জন্য প্রায় ১ হাজার ডলার প্রয়োজন হয়। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলের রসায়নবিদেরা একটি হলুদ রঙের পাউডার তৈরি করেছেন, যা কার্বন ডাই-অক্সাইড অনেক বেশি কার্যকরভাবে শোষণ করতে পারে বলে দাবি করা হচ্ছে।

বার্কলের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থী জিহুই ঝৌ ও অধ্যাপক ওমর ইয়াঘি একটি স্ফটিক যৌগ তৈরি করেছেন, যার তাঁরা নাম দিয়েছেন সিওএফ-৯৯৯। এটি হাইড্রোকার্বনের একটি ক্ষুদ্রাকার কাঠামো। এই কাঠামো শক্তিশালী কার্বন-নাইট্রোজেন এবং কার্বন-কার্বন বন্ধনে আবদ্ধ। এই কাঠামোর ফাঁকা জায়গায় অ্যামিন (নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেনের চেইন) বসানো থাকে, যা বায়ু থেকে পাওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডের কণাগুলো ধরে রাখে। অক্টোবর মাসে *নেচার*-এ প্রকাশিত এক গবেষণায় ঝৌ ও ইয়াঘি লিখেছেন, পাউডারটি কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণের সর্বোচ্চ হার প্রদর্শন করেছে।

পাউডারটি ব্যবহারের ফলে তুলনামূলক কম শক্তি ব্যবহার করে বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড সরানো সম্ভব হবে। ফলে এই প্রক্রিয়ায় খরচও কমে যাবে।

কিআ প্রতিবেদক

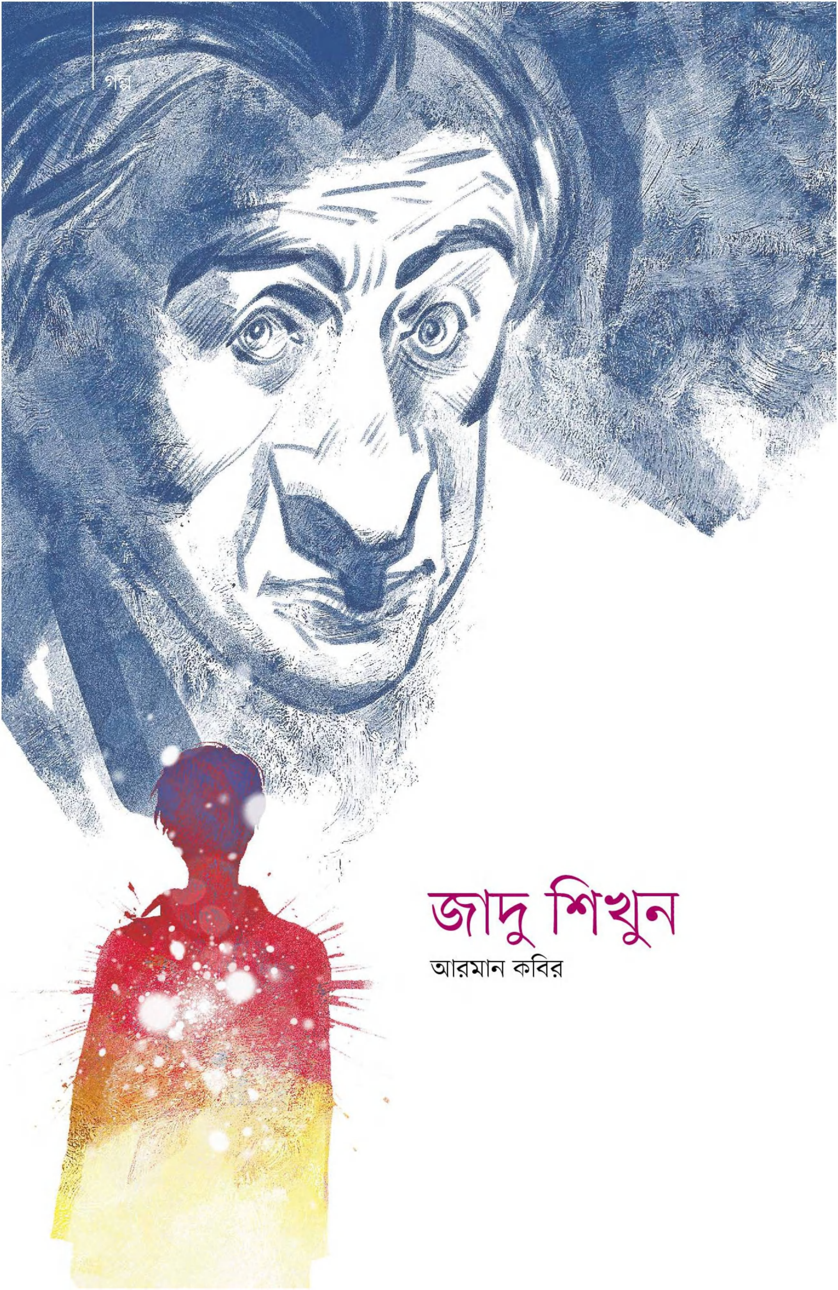

জাদু শিখুন

আরমান কবির

জাদু শিখুন
নম্বর- ০১৭********৯

বিকেলে গিটার ক্লাস থেকে ফেরার সময় সৈকতের চোখে পড়ল সাইনবোর্ডটা। সাদার ওপর লাল কালিতে লেখা।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে এক দৌড়ে পাশের দোকান থেকে একটুকরো কাগজ নিয়ে এল সৈকত। পকেটে একটা বলপয়েন্ট ছিল। নম্বরটা টুকে নিতে লাগল কয়েক সেকেন্ড।

রাস্তাঘাটে জাদু শেখার সাইনবোর্ড বেশ স্বাভাবিক ব্যাপার হলেও মনে রাখবেন, যখন আপনি কোনো জিনিস খুব করে খুঁজবেন, তখন সেটা পাবেন না। সৈকতের সঙ্গেও তা-ই হচ্ছিল। আজ কপালগুণে ভিকারুন্নিসা নূন স্কুল পার হতেই পেয়ে গেছে।

ঝড়ের বেগে বাসায় এসে গিটার কাঁধে নিয়েই ল্যান্ডফোনের সামনে বসে পড়ল সৈকত। ডায়াল করল। রিং হচ্ছে. . . .

'কে? ' ঠান্ডায় বসে যাওয়া একটা কণ্ঠ।

'সাইনবোর্ড দেখে কল করলাম, জাদু শেখানো হয় না এখানে? '

ন্যানোসেকেন্ডের নীরবতা, 'হুম, রাইট। বলেন। '

'জায়গাটা কোথায়? আমি শিখতে চাই। ' নিজের কণ্ঠের উত্তেজনা ঢেকে রাখতে পারল না সৈকত।

'বাসাবো চিনেন? ' মানুষটা বিরক্ত মনে হলো কেন যেন, 'বৌদ্ধমন্দির খুঁইজ্জা বাইর করবেন। উল্ডা দিকের গল্লির ভিত্রে। সিডির দোকানের উল্ডা দিকের সবুজ গেট। বিকাল পাঁচটার পর আহেন। '

আর কিছু বলার সুযোগ পেল না সৈকত। কেটে গেছে লাইন।

সেদিন বিকেল যেন আর আসতে চায় না।

সৈকতের মনে হলো, জীবনের দীর্ঘতম দুপুর পার হয়ে অবশেষে ঘড়িতে চারটা দশ বাজল। বাসার কারও দুপুরের ভাতঘুম না ভাঙিয়ে জমানো সাত শ টাকা পকেটে নিয়ে চুপিসারে বেরিয়ে এল বাইরে। মাঘের শেষ বিকেলের জমাটি শীত আর হালকা কুয়াশা ঘাড়ে নিয়ে সাইকেলের প্যাডেল চাপল সৈকত। ছোট ভাই সাগরের সাইকেলটা চুপি চুপি নিয়ে এসেছে।

প্যাডেলের তালে তালে মাথায় এলোপাতাড়ি কিছু চিন্তা চলছে ওর।

বাবা না থাকায় মনে হয় কিছু সুবিধাই হয়েছে। সৈকতের জিগরি দোস্ত সুমন তো ওর বাবার ভয়েই আসতে পারল না। কিন্তু ওই বেচারার আগ্রহ আরও বেশি ছিল। কিন্তু ওর বাপ জাদুফাদু শেখার কথা শুনতেই, 'হারামজাদা, ক্লাস নাইনে অল সাবজেক্টে পাস করে উঠতে না পারলে...। ' অল্পের জন্য লাথিটা ফসকে গেছে।

সৈকতের বাবা কোথায়, ও জানে না। ছোটবেলায় শুনেছিল, বিদেশে থাকেন বাবা। আসবেন কোনো এক দিন। এরপর সিক্সে যখন উঠল, একদিন শুনল যে মা-বাবা আলাদা থাকেন। কিন্তু কেন, তা জানা নেই ওর। কেউ বলার প্রয়োজন মনে করে না।

একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। এই যে জাদুর প্রতি এত আগ্রহ, মাথার ওপর বাবা নামক অমন একখানা যমদূত থাকলে কি আর সম্ভব হতো আজকের এই অভিযান? নেভার!

বৌদ্ধমন্দির খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলো না। এদিকে ক্রিকেট খেলতে আগেও বার দুয়েক এসেছে সৈকত।

সত্যিই উল্টো দিকে দেড় মানুষ সমান একটা সরু গলি চলে গেছে। সাইকেল থামিয়ে আলগোছে ডান পকেটে হাত ছুঁইয়ে নিল ও। সাত শ টাকা জমাতে আড়াই মাস সময় লেগেছে। এতে হবে তো? নাকি আরও বেশি লাগে?

ধুর, যা হয়, হবে!

প্যাডেল মেরে গলিতে ঢুকে গেল সৈকত।

পাশাপাশি দুটো রিকশা চলার মতো জায়গাও নেই গলিতে। এতই সরু। আর ভিড়ে ভিড়াক্কার। মস্কো, গুলিস্তান আর নিউইয়র্ক যেন একত্রে সেঁধিয়েছে এখানে, ঢাকার এই এক কোণে।

শ খানেক গজ যেতেই সৈকতের কানে আসে, 'মেয়ে... তুমি কি দুঃখ চেনো? চেনো না!'

সিডির দোকান হাতের ডান দিকে। এলআরবির এই গান ওদের ওপর তলার নিক্সন ভাই শোনে জোরে জোরে।

সিডির দোকানের উল্টো দিকে রং জ্বলে যাওয়া সবুজ গেট দাঁড়িয়ে আছে প্রায় অন্ধকার একটা উঠোন পেছনে নিয়ে।

সাতপাঁচ না ভেবে গেটে টোকা দিল সৈকত।

'কে আপ্নে?' অজস্র ফুটোওয়ালা স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে রোগা এক লোক একটু ফাঁক করেছে সবুজ গেটটা।

'ইয়ে... আমি ফোন করেছিলাম...'

'ওহ, ভিত্রে আহেন,' ছোটখাটো মানুষটার লম্বাটে মুখ আর কুচকুচে কালো গোঁফ, কপালে চিরস্থায়ী ভ্রুকুটি। গোটা জগতের ওপর থেকে তার মন উঠে গেছে মনে হয়। সোজা ভেতরে আঙুল উঁচিয়ে দেখিয়ে দেয় লোকটা, 'বারান্দায় উইঠ্যা হাতের ডাইনের ঘর। সিধা যান গা।'

সাইকেলটাকে এক পাশে ঠেস দিয়ে রেখে চারদিকে একপলক দেখে সৈকত। এক টুকরা উঠানের মতো জায়গা। সিমেন্টে বাঁধানো ছিল হয়তো একসময়। এখন জায়গায় জায়গায় তলার কালো মাটি উঁকি দিচ্ছে। সাত-আটটা বিশাল প্রাচীন গাছ অনেকখানি অন্ধকার এঁকে দিয়েছে চারপাশে। একটা গাছের নামও আন্দাজ করতে পারল না সৈকত। কিন্তু ওপর দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো, মাঘের আকাশ দেখা যায় না। এতই ঘন এই সব প্রাচীন মহিরুহের বিস্তার।

হলদে দেয়ালের এ রকম বাড়ি ঢাকা শহরে আর দেখেনি সৈকত। অবশ্য এ শহরের কতটুকুই বা ওর দেখা!

তবে পানাম সিটিতে বেড়াতে গিয়ে এ রকম কয়েকটা বাড়ি দেখেছিল সৈকত গত বছর। আর...ও হ্যাঁ, পুরান ঢাকায় দেখেছিল মনে হয়! বাড়িটা একতলা আর বেশ ছড়ানো বারান্দা থেকে চওড়া দুই ধাপ সিঁড়ি নেমে এসেছে পরিত্যক্ত উঠোন পর্যন্ত।

গোটা জায়গাটার পরিপূর্ণতা ফুটিয়ে তুলতেই বোধ হয় একটা কুচকুচে কালো বিড়াল সিঁড়িতে বসে বাটি থেকে চুকচুক করে দুধ খাচ্ছে। সৈকত পাশে গিয়ে দাঁড়াতেও মুখ তুলে তাকাল না ও।

'কানা বিলাই। আপনে ভিত্রে যান।' পেছন থেকে বলে ওঠে মহা বিরক্ত গেটম্যান।

কানা বিড়াল!

অন্ধ বিড়াল এই প্রথম দেখল সৈকত। শোনেওনি কখনো এর আগে।

বারান্দায় উঠে হাতের ডান দিকে শেষ মাথায় সাদার ওপর ছোট ছোট খয়েরি ফুল ছাপা পর্দা দেখে সেদিকে এগোয় সৈকত। একটা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে বারান্দায়।

বেশ সাধারণ একটা বসার ঘর।

বেতের ছোট্ট একটা টেবিল ঘিরে তিন দিকে সোফা। দুটো সিঙ্গেল আর একটা ডাবল। আর একদিকে বুকশেলফ। মেঝে থেকে সৈকতের বুকসমান হবে তার উচ্চতা! আর তাতে ঠেসে রাখা আছে শ তিনেক বই।

সৈকত নিজে বইয়ের পোকা হওয়ায় চট করে চোখে পড়ে দারুণ দারুণ বিষয়ের ওপর বেশ ভালো কিছু বই। প্রাচীন সভ্যতা ও জ্যোতির্বিদ্যা, হয়তো অজানা কোনো গ্রহ, ফারাও রাজসভা ও জাদুকরের আদ্যোপান্ত ইত্যাদি সব নাম সৈকতের রক্তে রোমাঞ্চের সুর তুলে দেয়। আরও একটা ঢাউস বই চোখে পড়ে ওর। সম্ভবত সবচেয়ে পুরোনো আর সবচেয়ে মোটা ইরাক, আফ্রিকা ও ল্যাজারাস পিট!

'এ রকম কিছু বই আমার কাছে আছে, লোকে জানতে পারলে আমাকে খুন করে হলেও ওসব বাগাবে, বুঝলে?' ভরাট একটা কণ্ঠ আচমকা সৈকতকে চমকে দিয়েছে। মনে হলো, চমকের ধাক্কায় আরেকটু হলে দেহ থেকে চামড়া আলাদা হয়ে যেত ওর!

সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা বেশ লম্বা এক মানুষ বসে আছেন সিঙ্গেল সোফাটায়। হাত দুটো জড়ো করে রেখেছেন কোলের ওপর। কিন্তু কোন ফাঁকে তিনি এলেন, খেয়াল করল না কেন সৈকত?

'ঘাবড়ে গেলে নাকি? বসো।' ভরাট কিন্তু নরম কণ্ঠেই বললেন ভদ্রলোক।

কুচকুচে কালো ব্যাকব্রাশ করা চুল, ঘন ঝোপের মতো এক জোড়া ভুরু আর তার নিচে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ এক জোড়া চোখ। জ্বলজ্বল করছে। সৈকতের মনে হলো, ঠিক যেন গভীর সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো কোনো ডুবোজাহাজের সার্চলাইট। ওর আরও মনে হলো, এই চেহারা কোথায় যেন সে দেখেছে...

'অমন করে কী দেখছ? জাদু শিখবে বলে এসেছ? একটা সিগারেট খাই?' গোল্ডলিফের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার মেঘ তৈরি করলেন ভদ্রলোক।

'আপনি জাদুকর?' সামলে নিচ্ছে সৈকত।

'জাদু কেন শিখতে চাও সৈকত?' লোকটার চোখের কোণে হাসি খেলে যায়, ঠোঁটে নয়। কণ্ঠে কী যেন আছে...

'ছোটখাটো জাদু আমি শিখতে চাই না। আমি বড় কিছু চাই... কপারফিল্ড বা...' কিন্তু একবারও ভাবল না, ওর নাম তো এই লোকের জানার কথা নয়।

'কখনো শেখার চেষ্টা করেছ এর আগে?'

উৎসুক সৈকত দ্রুত পকেটে হাত দিয়ে একটা এক টাকার পয়সা বের করে কিছু হাতসাফাই দেখায়। সবই সস্তাদরের জাদু। পামিংয়ের নানা কৌশল। পি সি সরকার আর জুয়েল আইচের বই পড়ে শেখা।

'এগুলো? এগুলো জাদু?' সিনেমার অভিনেতাদের মতো একঝটকায় মাথা পেছনে হেলিয়ে হেসে উঠলেন জাদুকর। কিন্তু নিচু আওয়াজে। সাধারণত এ রকম হাসি উচ্চ স্বরেই হাসে লোকে।

তারপরই আচমকা তড়িৎগতিতে ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন বুকশেলফের দিকে।

আর ওমনি সৈকতের চোখ ছানাবড়া করে দিয়ে ঢাউস আকারের সবচেয়ে মোটা বইটা ছিপে টানা মাছের মতো উড়ে এসে জাদুকরের হাতে সেঁটে গেল।

'শোনো, জাদু কি খেলা? যাকে-তাকে যখন-তখন এক-দুই হাত দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার নামই কেবল জাদু?' এতক্ষণে সৈকত টের পেল যে ওনার কণ্ঠে রয়েছে তিরস্কার! নিখাদ ঘৃণামিশ্রিত তিরস্কার। যেন সৈকত খুব নিচু শ্রেণির কোনো প্রাণী। বড় স্পর্ধা দেখিয়ে ফেলেছে।

একটু ঘাবড়ে গিয়ে কী যেন বলতে নেয় সৈকত, কিন্তু তার আগেই...

'এই, এই ছেলে! তাকাও এদিকে...' বারান্দা থেকে পর্দা ঠেলে প্রবেশ করেছে আরও একজন...দেখতে হুবহু...মানে যাকে বলে জেরক্স কপি...সামনে বসে থাকা মানুষটার ক্লোন যেন! এ রকমও কি সম্ভব?

চুল, চেহারা, চোখ, পোশাক, গড়ন—ঠিক যেন আয়নায় কোনো প্রতিবিম্ব!

সৈকত টের পেল, পিঠের দিকটা ঘেমে গেছে ওর। ঘরের কম পাওয়ারের বাল্বে ভুলভাল দেখছে নাকি? নিজেরই সন্দেহ হচ্ছে ওর।

'এই ছেলে তাকাও এদিকে!' প্রথমজন কথা বলে উঠল এ সময়।

নিজেকে ফাঁদে আটকে পড়া জানোয়ার মনে হলো সৈকতের।

'তোমার জীবনের সেরা জাদুটা তোমাকে দেখাব আমি, তাকাও এদিকে।'

'এদিকেও তাকাও একবার, এই যে... '

এ রকম অভিজ্ঞতা আর কারও কখনো হয়েছে কি না, সৈকতের জানা নেই, কিন্তু ও পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে ও ভয় পেয়েছে। দুদিক থেকে দুজন একই রকম মানুষ, একই সুরে ওকে ডাকছে। যেন প্রতিবিম্ব থেকে প্রতিবিম্ব হয়ে চলেছে অশুভ কোনো প্রতিধ্বনি।

সামনের জনের দিকেই তাকাল সৈকত। কিন্তু সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। তাকাতে সে চায়নি। যেন অদৃশ্য কেউ সুতা টেনে তাকে বাধ্য করেছে তাকাতে। সেই অদৃশ্য শক্তির উৎস কি সামনে বসে থাকা মানুষটা? যে অদ্ভুত কোনো ক্ষমতাবলে নিজের একাধিক সত্তা তৈরি করতে পারে?

সৈকত টের পাচ্ছে, চিন্তার স্থিরতা হ্রাস পাচ্ছে ওর। দৃষ্টিশক্তি অস্বচ্ছ হয়ে আসছে।

মাঘের শেষ বিকেল কি বিদায় নিচ্ছে? শীতের সন্ধ্যা নেমে এসেছে? কেন যেন মনে হলো, শীতের মায়াবী সন্ধ্যা ওর আর দেখা হবে না। শীতকালটা ওর বড্ড পছন্দের যে...

আবছাভাবে কী যেন একটা কানে আসে সৈকতের। সুর করে নামতার মতো কী যেন পড়ছে কেউ। গুনগুন করে... না, না। নামতা বলা ঠিক হলো না। কবিতার মতো। ছন্দ আছে।

নেফুরাত আলাজিয়াত
নাজারেথ ইয়াহা
বাবিল্যাথ ইয়াবাত
বারজাখে গায়্যাবা...

ঘোর লাগা সুর, ক্রমে ফিসফিস থেকে পর্দা উঁচুতে উঠে আবার ধীরে ধীরে নেমে যায় ফিসফিসে। ষড়যন্ত্র আর শয়তানিতে ভরা! কলিজায় ভয় ধরে যায় সৈকতের। কিন্তু কিসে যেন গেঁথে ফেলেছে ওকে। একচুল নড়ার শক্তি নেই।

চারদিকে আলো আরও কমে এসেছে। প্রায় বুজে আসা চোখ বার দুয়েক মিটমিট করে আবার মেলতে চাইল সৈকত। একই রকম দুটি মানুষ, যেন আয়নার প্রতিবিম্ব দুই দিক থেকে এসে ওর হাঁটু ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

চোখ মেলে রাখা প্রায় অসম্ভব...মায়ের মুখটা মনে পড়ল সৈকতের...

আমি সৈকত।

সেই যে জাদু শিখতে গেলাম যে... মনে পড়েছে নিশ্চয়ই!

অনেকেই কিন্তু আমাকে ভুলে গেছে। খুব কাছের একজন কি দুইজন বন্ধু বাদে কেউই মনে রাখেনি। যেমন সুমন আর ইকরামকে দেখলাম, সেদিনও স্কুলের মাঠে গাছের নিচে বসে আমার কথাই আলোচনা করছে।

মা আজও আমার অপেক্ষায় বারান্দায় দাঁড়ান। সময় পেলেই। চোখ দুটো অস্থির হয়ে আমার মুখটা খুঁজে ফেরেন অন্য ছেলেদের মুখে মুখে।

আজ ১৫ মাস পেরিয়ে গেছে আমি পৃথিবীর জীবন থেকে হারিয়ে গেছি। টিকে আছি অদৃশ্য এক জগতে। দেখি সবকিছুই। থাকি আশপাশেই। কিন্তু আমাকে কেউ দেখে না।

স্কুলের মাঠে সুমন আর ইকরাম যখন আমাকে নিয়েই কথা বলছিল, কত চেষ্টা করলাম ওদের একটু ডাকার, কাঁধে হাত দেওয়ার! পারলাম না!

মা যখন বুকে পাথর নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, আমি তো পাশেই থাকি। কিন্তু প্রাণপণে লড়েও পারি না মাকে একটু ছুঁয়ে দিতে। বলতে পারি না, মা, এই যে আমি! তাকাও এদিকে!

রাগে, হতাশায় বুক ফাটিয়ে কাঁদি। চেঁচাই আকাশ কাঁপিয়ে। তবু কেউ শোনে না।

জাদুকর আমাকে অদৃশ্য করে দিয়েছে।

এখানে আমার মতো অনেকেই আছে, জানেন? ঢাকা শহরেই বিভিন্ন জায়গায় এদের দেখি। আমার মতোই সারাক্ষণ দৃশ্যমান জগতে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে যায় এরা। ফার্মগেটের ওখানে একটা ছেলে আছে। আমার চেয়ে কয়েক বছর বড়ই হবে হয়তো। প্রতিদিন ওভারব্রিজ থেকে লাফিয়ে পড়ে। কখনো বাস চলে যায় ওর গায়ের ওপর দিয়ে। হাত-পা ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। পাজর ফেটে যায়। ইশ্! কী যন্ত্রণা! কী সেই আর্তনাদ!

কিন্তু মৃত্যু আসে না।

সেই আর্তনাদও কেউ শোনে না।

কমলাপুরের ব্রিজ থেকে আমিও একদিন চেষ্টা করেছিলাম। পারিনি। সাহসে কুলায় না।

বয়স্কমতো এক লোক এগিয়ে এসে বলল, 'লাভ নেই। এই জগতে মৃত্যু নেই। পারো তো দূরে কোথাও চলে যাও। আমি তো বেশ ঘুরেটুরে বেড়াই। গত পরশু দিল্লি থেকে ফিরলাম।'

ক্রমাগত কয়েক মাস চেষ্টা করে একটা কলম ধরতে পেরেছি। অদৃশ্য হয়ে গেলে অনেক ক্ষমতাই হ্রাস পায়। ছোঁয়া যায় না কিছু, কথা কওয়া যায় না কারও সঙ্গে! তবে অদম্য ইচ্ছা আর দিনের পর দিন চেষ্টা করে এটুকু পেরেছি। এক দোকান থেকে দুই পাতা কাগজ আর একটা কলম নিয়ে লিখে ফেললাম আমার অভিজ্ঞতা।

যাতে জাদু শিখতে আর কেউ এই অভিশাপের কবলে না পড়ে। অনেকেই তো এসব বিজ্ঞাপন দেখে আমার মতো দৌড়ে যায়। একটু বিস্ময়কর ক্ষমতা, একটা বাহ্বা আর 'বহুত আচ্ছা'র লোভে মানুষ কত কী-ই না করতে যায়। হ্যাঁ, লোভ!

লোভই আজ আমাকে এই জগতের বাসিন্দা বানিয়েছে।

মা যখন বুকে পাথর নিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে, আমি তো পাশেই থাকি। কিন্তু প্রাণপণে লড়েও পারি না মাকে একটু ছুঁয়ে দিতে। বলতে পারি না, মা, এই যে আমি! তাকাও এদিকে!

খবরদার! ঢাকা শহরের কোথাও জাদু শেখার ওই সাইনবোর্ড দেখলেই দৌড়ে যাবেন না।

খসরু তার নাম। খসরু দ্য ম্যাজিশিয়ান।

ভয়ংকর সব অশুভ ক্ষমতার অধিকারী। জাদু শেখানোর নাম করে আমার মতো অসংখ্য মানুষকে এই ফাঁদে ফেলেছে এই লোক।

কে সে, কোথা থেকে এল, কেউ জানে না। শুধু এটুকুই জানা যায় যে দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে ঘুরে একই কাজ করে বেড়ায়। এর কোনো স্বার্থ নেই। নেই কোনো উদ্দেশ্য।

একটা গাছের নিচে বসে এই লেখা লিখে চলেছি। মনে আশা, দূর থেকে কেউ হয়তো দেখবে, শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে কাগজ আর কলম। দৌড়ে আসবে কাছে। কথা বলবে। একটু ছুঁয়ে দেখতে চাইবে।

কিন্তু আফসোস, মানুষ ভূত ছাড়া কিছু কল্পনা করতে পারে না।

অলংকরণ : **এস এম রাকিব**

আলোচিত ২০২৪

বছরে শুরু হয়েছিল জাপানের ভূমিকম্পের খবর দিয়ে। আর নভেম্বর মাস শেষ হয়েছে আজারবাইজানের বাকু শহরে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের ঘটনাবলি নিয়ে। এর মধ্যে মুক্ত হয়েছেন জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কিআ পাঠকের জন্য এখানে আছে ২০২৪ সালের আলোচিত ঘটনা ।

১ জানুয়ারি, জাপানে ভূমিকম্প

বছরটা শুরু হয়েছিল জাপানের মধ্যাঞ্চলে ৭.৬ রিখটার স্কেলের ভূমিকম্পের খবর দিয়ে। ১ জানুয়ারি ২০২৪-এর এই ভূমিকম্পে মারা যায় ১২০ জন। আহত হয় ১০০ জন। এই দিনে দেশটিতে এক দিনে ১৫৫টি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয়েছিল জাপানের ইশিকাওয়া অঞ্চল।

বিভিন্ন এলাকায় ভবন ধসে পড়ে, রাস্তাঘাট ভেঙে যায় এবং হাজার হাজার ঘরবাড়ির বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পরদিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন এসব এলাকায় পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছিল উদ্ধারকারীরা। ভূমিকম্পের পর জাপানের পশ্চিম উপকূলে সুনামি আঘাত হানে। ১ মিটার বা ৩ দশমিক ৩ ফুটের বেশি উচ্চতার ঢেউ উপকূলে আছড়ে পড়ে। ২ জানুয়ারি জাপানের আবহাওয়া দপ্তর সুনামির সতর্কতা তুলে নেয়।

৯ জানুয়ারি, এক লাখ বছরের মধ্যে পৃথিবীর উষ্ণতম বছর ২০২৩

পৃথিবীর উষ্ণতার আগের সব রেকর্ড ভেঙে ২০২৩ সালকে সবচেয়ে উষ্ণতম বছর হিসেবে ঘোষণা করা হয় ৯ জানুয়ারি। শুধু তা-ই নয়, বলা হচ্ছে, সম্ভবত গত এক লাখ বছরের মধ্যে পৃথিবী সবচেয়ে উষ্ণতার রেকর্ড গড়েছে গত বছর। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস ৯ জানুয়ারি এ কথা জানিয়েছে। কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিসের তথ্যমতে, জীবাশ্ম জ্বালানির বহুল ব্যবহার শুরুর আগের দীর্ঘ সময়ের গড় উষ্ণতা বৃদ্ধির তুলনায় গত বছর পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় ১ দশমিক ৪৮ ডিগ্রি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এমন উষ্ণ হয়ে উঠেছে পৃথিবী। কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের এই অনুমান সত্যি হতে যাচ্ছে ২০২৪ সালের জন্যও। প্রায় নিশ্চিতভাবে ২০২৩ সালের রেকর্ড ভেঙে ইতিহাসের উষ্ণতম বছর হিসেবে ঘোষিত হতে যাচ্ছে ২০২৪।

মার্চ ১০, ‘ওপেনহেইমার’ময় অস্কার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমা হামলার ক্ষত এখনো তাড়া করে ফেরে পৃথিবীকে। অথচ সেই আণবিক বোমার জনক জে রবার্ট ওপেনহেইমারকে নিয়ে নির্মিত সিনেমা *ওপেনহেইমার* নিয়ে মাতামাতি ছিল বছরের প্রথম অংশজুড়ে। নতুন করে পুরোনো প্রশ্নকে উসকে দিয়েছে—ক্রিস্টোফার নোলানের *ওপেনহেইমার* সিনেমাটি দিয়ে কি নিজেদের ইমেজে একটু প্রলেপ দেওয়ার চেষ্টা করছে পশ্চিমা বিশ্ব? কেউ কেউ অভিযোগ করেছেন, সিনেমাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর মতাদর্শকে প্রচার করা হয়েছে। পারমাণবিক বোমা ও ওপেনহেইমারের সাফাই গাওয়া হয়েছে। তবে বিতর্ক যা-ই হোক, মুক্তির পর ব্যবসায়িক সাফল্য থেকে শুরু করে সমালোচকদের প্রশংসা—সবই পেয়েছে *ওপেনহেইমার*। পেয়েছে গোল্ডেন গ্লোব, বাফটাসহ চলতি বছরের গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার। অস্কারেও যে ছবিটি রাজত্ব করবে, সে পূর্বানুমান আগেই করেছিলেন সমালোচকেরা। ১০ মার্চ ভোরে লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে জিমি কিমেলের সঞ্চালনায় ৯৬তম অস্কার অনুষ্ঠানে এ আসরের সর্বোচ্চ সাতটি পুরস্কার জিতে নিয়েছে সিনেমাটি। সেরা সিনেমা, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতাসহ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের পুরস্কার পেয়েছে *ওপেনহেইমার*। ২৫ বছরের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে এই প্রথম সেরা নির্মাতা হিসেবে অস্কার জিতেছেন ক্রিস্টোফার নোলান।

এপ্রিল ২, বিলিয়নিয়ার হলেন টেলর সুইফট

ফোর্বস-এর প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, বিভিন্ন দেশে টেলর সুইফটের ইরাস ট্যুরের টিকিট বিক্রির অর্থ এসেছে ৭৮০ মিলিয়ন ডলার। সর্বকালের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী গানের সফর হিসেবে নাম লিখিয়েছে এই ট্যুর। এ সফর থেকে আয়ের মাধ্যমে ৩৩ বছর বয়সী গায়িকা নাম লিখিয়েছেন বিলিয়নিয়ার হিসেবে।

টেলর সুইফট গান নিয়ে আছেন প্রায় দুই দশক ধরে। এ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ১০টি জনপ্রিয় অ্যালবাম। অ্যালবামের প্রকাশনাকে উদ্‌যাপন করতেই ইরাস ট্যুর শুরু করেন তিনি। এ ট্যুরের প্রযোজকও তিনি।

টেলর সুইফটই প্রথম মানুষ, যিনি শুধু গানের ওপর ভিত্তি করে বিলিয়নিয়ার হয়েছেন। *ফোর্বস*-এর অনুমান ছিল, তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি। নিজের যোগ্যতায় ধনী হওয়া মার্কিন নারীদের মধ্যে ৩৪ নম্বরে ছিলেন এই গায়িকা। ৬টি বিলাসবহুল বাড়ি ও ১০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি ব্যক্তিগত জেট বিমান রয়েছে সুইফটের।

মে ৪, রিওতে ১৬ লাখ দর্শকের সামনে গাইলেন ম্যাডোনা

৬৫ বছর বয়সী গায়িকা ম্যাডোনা। এই বয়সে 'সেলিব্রেশন ট্যুর'-এর কনসার্টে ঝড় তুলতে দেখা গেছে তাঁকে। ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে পরের মে মাস পর্যন্ত কনসার্টের ভিত্তিতে এ তালিকা প্রকাশ করেছে পলস্টার। ম্যাডোনার কনসার্টে ১৭৯ মিলিয়ন ডলারের টিকিট বিক্রি হয়েছে; তালিকার শীর্ষে ছিলেন ম্যাডোনা। ১৯৮৩ সালে পেশাদার গানের দুনিয়ায় যাত্রা শুরু করেন ম্যাডোনা। ১৯৮৪ সালে এক সাংবাদিক ম্যাডোনাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার স্বপ্ন কী?' তিনি বলেছেন, 'আমি দুনিয়াটাকে জয় করতে চাই।'

সত্যিই দুনিয়াটাকে জয় করেছেন ম্যাডোনা। নারীদের জন্য পপসংগীতে নতুন পথ রচনা করেছেন; চার দশক আগে ২৭ জুলাই মুক্তি পেয়েছিল তাঁর প্রথম অ্যালবাম। এরপর আশি ও নব্বইয়ের দশকে তিনি হয়ে ওঠেন পপসংগীতের 'রানি'। তাঁর মাতাল করা গায়কি আর উদ্দাম নাচের তালে বুঁদ হয়েছিলেন সারা দুনিয়ার শ্রোতা-দর্শক।

এমনকি ৬৫ বছর বয়সে এসেও দমে যাননি। গানে চার দশক পূর্তি উপলক্ষে গত বছর শুরু হয় ম্যাডোনার 'দ্য সেলিব্রেশন ট্যুর' কনসার্ট। ২০২৩ সালের ১৪ অক্টোবর লন্ডনে শুরুর পর ৪ মে রিও ডি জেনিরোতে ঐতিহাসিক শো দিয়ে শেষ হয় আলোচিত এই কনসার্ট ট্যুর, যেখানে ১৬ লাখ দর্শক বিনা মূল্যে কনসার্টটি উপভোগ করেন।

মে ৮, প্রেসিডেন্ট হিসেবে পঞ্চম মেয়াদে শপথ নিলেন পুতিন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে পঞ্চম মেয়াদে শপথ নিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। ক্রেমলিনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ছয় বছর মেয়াদে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করতে শপথ নেন ৭১ বছর বয়সী পুতিন। তবে এ অনুষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলো বর্জন করেছে।

পুতিন ১৯৯৯ সাল থেকে প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় রয়েছেন। ইউক্রেনে দুই বছর আগে অভিযান শুরু করার পর নতুন করে আবার তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন। পুতিন মার্চে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পান। এ নির্বাচনে যুদ্ধবিরোধী দুই প্রার্থীকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি।

পুতিনের কট্টর সমালোচক ও বিরোধী বলে পরিচিত অ্যালেক্সি নাভালনি নির্বাচনের আগেই একটি কারাগারে আকস্মিকভাবে মারা যান। পুতিনের অন্য সমালোচকেরা কেউ কারাগারে বা কেউ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। শপথ নেওয়ার পর নাভালনির স্ত্রী নির্বাসনে থাকা ইউলিয়া নাভালনায়া প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে বিরোধীদের প্রতি আহ্বান জানান। যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করে বলেছে, রাশিয়ার নির্বাচন অবাধ ও স্বচ্ছ হয়নি।

জুন ২৪, জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের মুক্তি

এপ্রিল ২০১০ সালে ‘উইকিলিকস’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান ভয়ংকর এক ভিডিও ফাঁস করে দেয়। তাতে দেখা যায়, হেলিকপ্টার থেকে মার্কিন সেনারা নিরপরাধ ইরাকিদের গুলি করে হত্যা করছেন। ১৮ জন সাধারণ মানুষকে খুন হতে দেখা যায় সেই ভিডিওতে। তাঁরা কেউই সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিলেন না। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের সাংবাদিক নামির নুর-আলদিন ও তাঁর সহকারী সায়ীদ ইশমাঘও ছিলেন। সেটা ২০০৭ সালের কথা। দিনটি ছিল ১২ জুলাই।

এর আগেও গুয়ানতানামো বে কারাগারে ইরাকিদের নির্যাতন নিয়ে ভিডিও ও বিভিন্ন দলিল ফাঁস করেছিল উইকিলিকস। তবে ২০১০ সালের এপ্রিলের সেই ভিডিও ফাঁস ছিল বড় ঘটনা। ওই বছরের জুলাই থেকে অক্টোবরের মধ্যে সংগঠনটি আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা নিয়ে প্রায় ৯০ হাজার এবং ইরাক যুদ্ধ নিয়ে প্রায় ৪ লাখ দলিল ফাঁস করে ইন্টারনেটে। এর মাধ্যমে বিশ্বের কাছে প্রমাণিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধাপরাধ। উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ হয়ে ওঠেন মার্কিন আইন সংস্থাগুলোর চক্ষুশূল।

এ সময় জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ করেন দুই নারী। অ্যাসাঞ্জ তখন ইকুয়েডরের কাছে অ্যাসাইলাম, মানে আশ্রয় চান। ইংল্যান্ডে অবস্থিত ইকুয়েডর দূতাবাস তাঁকে আশ্রয় দেয়। তখন আর এ অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়নি; বরং অভিযোগ সরিয়ে নেওয়া হয়। পরে ২০১৯ সালে ইকুয়েডর আশ্রয় প্রত্যাহার করে নিলে লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ অ্যাসাঞ্জকে গ্রেপ্তার করে। যুক্তরাষ্ট্র তাঁর বিরুদ্ধে ১৭টি অভিযোগ আনে গুপ্তচরবৃত্তির। কম্পিউটারে অনধিকার প্রবেশের দায়েও মামলা করা হয়। তবে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। লন্ডনের হিজ ম্যাজেস্টিস প্রিজন বেলমার্শে তিনি কারাদণ্ড ভোগ করেন দীর্ঘদিন। অবশেষে চলতি বছরের ২৬ জুন কারামুক্ত হন অ্যাসাঞ্জ।

জুন ৮, চার জিম্মিকে উদ্ধার করতে ইসরায়েলের ২৪৭ ফিলিস্তিনি হত্যা

ফিলিস্তিনের গাজার মধ্যাঞ্চল থেকে চারজন জিম্মিকে জীবিত উদ্ধারের দাবি করে ইসরায়েল। দেশটির সামরিক বাহিনী ৮ জুন নুসেইরাত এলাকায় পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে তাঁদের উদ্ধার করে। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের একটি গানের উৎসব থেকে হামাসের সদস্যরা তাঁদের অপহরণ করেছিলেন বলে দাবি করেছে ইসরায়েল।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ঢুকে হামলা চালায় হামাস। ওই হামলায় দেশটিতে প্রায় ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হন। এ ছাড়া প্রায় আড়াই শ ব্যক্তিকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যান হামাসের সদস্যরা। সেদিন থেকেই গাজায় নির্বিচার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী। এতে ৮ জুন পর্যন্ত উপত্যকাটিতে অন্তত ৩৬ হাজার ৭৩১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত সাড়ে ৮৩ হাজারের বেশি। চার জিম্মিকে উদ্ধার অভিযানে ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণে নিহত হন ২৪৭ জন ফিলিস্তিনি, আহত হন ৬৯৮ জন।

২৯ জুন, ভারতের টি-২০ বিশ্বকাপ জয়

এ বছর যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে যৌথভাবে বসেছিল টি-২০ বিশ্বকাপের নবম আসর। এবারের আয়োজন ছিল বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসর। ২০ দলের আসরে নবাগত দল হিসেবে সুযোগ পেয়েছিল কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র ও উগান্ডা। তাদের সবাইকে হারিয়ে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতে নেয় ভারত। ফাইনালে ভারত মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। যেকোনো ফরম্যাটে এটাই ছিল প্রোটিয়াদের প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনাল। ভারতের দেওয়া ১৭৬ রানের টার্গেটে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস থামে ১৬৯ রানে। ৭ রানের ব্যবধানে টি-২০ বিশ্বকাপের শিরোপা জিতে নেয় ভারত। এটি ভারতের দ্বিতীয় টি-২০ বিশ্বকাপ শিরোপা। এর আগে ২০০৭ সালে টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথম আসরের শিরোপা উঠেছিল তাদের হাতে। টি-২০ ইতিহাসে প্রথমবারের মতো অপরাজিত থেকে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেল কোনো দল। বিশ্বকাপ জিতেই আন্তর্জাতিক টি-২০ থেকে বিদায়ের ঘোষণা দেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি ও রবীন্দ্র জাদেজা।

জুলাই ১৩, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে হত্যাচেষ্টা

স্থানীয় সময় শনিবার সন্ধ্যায় পেনসিলভানিয়ার বাটলার এলাকায় এক নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য দিচ্ছিলেন ট্রাম্প। তখনই তাঁর ওপর বন্দুকধারীর হামলার ঘটনা ঘটে। পাশের একটি ভবনের ছাদ থেকে গুলি চালান ক্রুকস নামের এক তরুণ। হামলার পর ট্রাম্পের একটি কান থেকে রক্ত ঝরতে দেখা যায়। এ সময় গুলিতে নিহত হন সমাবেশে অংশ নেওয়া এক ব্যক্তি। গুরুতর আহত হন দুজন।

পেনসিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের ভোটারদের তালিকা থেকে জানা যায়, ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টিরই এক নিবন্ধিত ভোটার ছিলেন ক্রুকস। এরপর ৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে হারিয়ে ভূমিধস জয় পান তিনি।

এই নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোট দেওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হতেন ক্রুকস। হামলা চালানোর সময় তাঁর হাতে এআর-১৫ আধা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ছিল বলে মার্কিন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে।

১৪ জুলাই, আর্জেন্টিনার কোপা আমেরিকা জয়

একদিকে যখন চলছে টি-২০ বিশ্বকাপ, তখন যুক্তরাষ্ট্রের আরেক প্রান্তে বসেছিল কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসর। এবারের আসর যৌথভাবে আয়োজন করেছিল কনমেবল ও কনক্যাকাফ। ফলে অংশগ্রহণ ছিল দুই আমেরিকার ৩২ দলের। ৩২ দলের লড়াইয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে শিরোপা নিজেদের করে নিয়েছে আর্জেন্টিনা। তিন বছর ধরে ফর্মের তুঙ্গে থাকা আর্জেন্টিনা এবার শিরোপা জিতেছে কোনো ম্যাচ না হেরেই। ফাইনালে কলম্বিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা জিতে নেয় আলবিসেলেস্তারা। এ নিয়ে ১৬তম বারের মতো কোপা আমেরিকা জিতল আর্জেন্টিনা।

১৫ জুলাই, স্পেনের ইউরো জয়

১২ বছর পর আবারও ইউরোপ জয়ের স্বাদ পেল স্পেন। ফাইনালে ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে চতুর্থবারের মতো ইউরোপ জয় করল স্পেন। এর আগেও ১৯৬৪, ২০০৮ ও ২০১২ সালে ইউরো জয় করেছিল 'লা রোহা'রা। এবারের ইউরো জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন একঝাঁক তরুণ তারকা। পেদ্রি, লামিনে ইয়ামাল, নিকো গঞ্জালেস, ফেরান তোরেস—কেউই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খুব একটা অভিজ্ঞ নন। একঝাঁক তরুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন দানি কারভাহাল, রদ্রি, মোরাতার মতো অভিজ্ঞ সেনানীরা। দুইয়ের মিশেলে লুইস দে লা ফুয়েন্তের অধীন ইউরো ছিনিয়ে আনে স্পেন।

জুলাই ২৬, অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান প্রথমবারের মতো আউটডোরে

গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিককে বলা হয় 'গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। আকর্ষণীয় ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে উদ্বোধন হয় এই অলিম্পিকের। অলিম্পিকে ২০০টির বেশি দলের প্রতিনিধিত্ব থাকে বলে বহু বৈচিত্র্যের উপস্থিতি যেমন থাকে, থাকে দৃষ্টিনন্দন আর চমকে ভরা দারুণ সব আয়োজনও।

প্যারিসের বুকে অবস্থিত সিন নদীতে হয়েছে এবারের অনুষ্ঠান। গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান স্টেডিয়ামের ভেতরই হয়ে এসেছে এত দিন। এই প্রথমবার স্টেডিয়ামের বাইরে উন্মুক্ত স্থানে হয়েছে উদ্বোধনী আয়োজন। স্টেডিয়ামে অ্যাথলেটরা প্যারেড করতেন, এবার তাঁরা সিন নদী পাড়ি দিয়েছেন। প্রায় ১০০টি নৌকা ও বার্জে করে আইফেল টাওয়ারের পূর্ব কোণের অস্টারলিটজ সেতু থেকে ট্রোকাড রোতে পৌঁছান তাঁরা। সেখানেই হয় মূল আয়োজন। বক্তব্য দেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ।

ফ্রান্সের থিয়েটার ডিরেক্টর থমাস জলির পরিকল্পনায় পুরো অনুষ্ঠান মোট ১২টি ভাগে ভাগ করা হয়। এতে অংশ নেন তিন হাজারের মতো নৃত্যশিল্পী, সংগীতশিল্পী ও বিনোদনকর্মী। অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা সিন নদীর দুই তীরে, সেতুতে ও কাছাকাছি স্মৃতিস্তম্ভগুলোয় ছিলেন। নটর ডেম ক্যাথেড্রালও ছিল এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের অংশ।

১ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন

যাত্রাবাড়ীর রায়েরবাগে ১১ তলা বাড়ির ৮ তলায় মা-বাবার সঙ্গে থাকত চার বছরের ছোট্ট আহাদ। একই দিনে তাদের বাড়ির সামনেই চলছিল সংঘর্ষ। আহাদ এ সময় বাড়িতেই ছিল, মা-বাবার পাশে। হঠাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। তার বাবা আবুল হাসান ভাবলেন, ছেলেটা মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। কিন্তু খানিক বাদেই বুঝলেন, ছেলের ডান চোখে গুলি বিঁধেছে। রক্তাক্ত ছেলেকে হাসপাতালে নেওয়ার সময়ও বাধা দিল অস্ত্রধারীরা। পরে হাসপাতালে মারা গেল ছেলে।

ঢাকার মিরপুরের কাফরুল এলাকার চারদিকে গত ১৯ জুলাই, শুক্রবার ছিল মুহুর্মুহু গুলির শব্দ। বিকট শব্দে আকাশে উড়ছিল হেলিকপ্টার। কাঁদানে গ্যাসের শেলের ধোঁয়াও ঢুকছিল ঘরে। নিরাপত্তার জন্য এ সময় জানালা বন্ধ করা ছাড়া উপায় কী! সিয়াম তাই জানালা বন্ধ করতে গিয়েছিল। এমন সময় বাইরে থেকে গুলি এসে তার মাথায় লাগে। জানালার পাশে সিয়ামের পড়ার টেবিলে থাকা বইপত্র আর প্লাস্টিকের খেলনা রক্তে ভেসে যায়...!

ঢাকায় যখন এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে, সেদিনই বাবার নিরাপদ কোলে থাকার পরও মারা যায় সাড়ে ছয় বছর বয়সী শিশু রিয়া গোপ। রিয়ারা থাকত নারায়ণগঞ্জের নয়ামাটি এলাকার চারতলা একটি বাড়ির একেবারে ওপরের তলায়। সেদিন রিয়া আপনমনে ছাদে খেলছিল। এর মধ্যে হঠাৎই ওদের এলাকায় শুরু হলো সংঘর্ষ। মেয়েকে ঘরে আনতে ছাদে গেলেন তাঁর বাবা দীপক কুমার গোপ। রিয়াকে মাত্রই কোলে নিয়েছেন, এ সময় কোথা থেকে ছুটে এল ঘাতক বুলেট। বাবার কোলে ঢলে পড়ল মেয়েটি।

এমন শত শত ঘটনা ঘটে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে। ১৬ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত সহিংসতায় মারা যায় অসংখ্য মানুষ। ১ জুলাই সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে টানা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অহিংস এই আন্দোলনে নজিরবিহীন আক্রমণ চালায় তৎকালীন সরকার ও তার অঙ্গসংগঠন। সহিংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় সর্বস্তরের মানুষ। ৫ আগস্ট পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ঘোষণা দেন।

১৯ আগস্ট, ফেনীতে বন্যা

১৯ থেকে ২২ আগস্ট—এই ৪ দিনে শুধু ফেনীতে ৪৩৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। একই সময়ে কুমিল্লায় বৃষ্টি হয়েছে ৫৫৭ মিলিমিটার, নোয়াখালীতে হয়েছে ৬০৫ মিলিমিটার বৃষ্টি, যা স্বাভাবিক বৃষ্টির তুলনায় অনেক বেশি। একই সময়ে ভারতের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ৩৭৫ মিলিমিটার, গোমতী জেলায় প্রায় ৩৫০ মিলিমিটার এবং আগরতলা ও এডিনগরে ১৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আগস্ট মাসের স্বাভাবিক বৃষ্টির তুলনায় এই বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি।

ফেনী ও কুমিল্লায় ভয়াবহ বন্যাসহ ত্রিপুরা রাজ্যসংলগ্ন মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, খাগড়াছড়িতে বন্যা মূলত ত্রিপুরা থেকে আসা অতিমাত্রার পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে একটানা অতিবৃষ্টির কারণে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

একই সঙ্গে ১৯ আগস্ট পূর্ণিমা তিথি হওয়ায় সাগরে সৃষ্টি হয়েছে অতিমাত্রার উঁচু জোয়ার, যা নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরের বন্যার মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং উজানের জেলাগুলোর বন্যার পানি সাগরে নেমে যেতে বিলম্ব হয়েছে।

আগস্ট মাসের শেষে দেশের ১১টি জেলার ৭৪টি উপজেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল। দেশের ১১টি জেলায় বন্যায় ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ৫৯ জনের মারা যাওয়ার তথ্য জানিয়েছিল দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১১টি জেলার ৬৮টি উপজেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। জেলাগুলো হলো ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, লক্ষ্মীপুর, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট। আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছিল ৩ হাজার ৯২৮টি। এগুলোয় ৩ লাখ ৯৩ হাজার ৩০৫ জনকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ৩৬ হাজারের বেশি গবাদিপশুকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

অক্সফামের তথ্য অনুযায়ী, এই বন্যায় বাস্তুচ্যুত হয় পাঁচ লাখের বেশি মানুষ। প্রায় ৫৮ লাখ মানুষ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অবকাঠামো, বাড়িঘর, কৃষি ও মৎস্য খাত। এসব ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে দুর্গত জনগোষ্ঠীর জরুরি ও ধারাবাহিক মানবিক সহায়তা প্রয়োজন। সারা দেশ থেকে মানুষ এসব বন্যাদুর্গত এলাকার মানুষদের সাহায্য করতে আসে।

৭-১১ অক্টোবর, নোবেল পুরস্কার পেলেন যাঁরা

প্রতিবছরের অক্টোবরে সুইডেন ও নরওয়ের নোবেল কমিটি বিজ্ঞান, সাহিত্য, অর্থনীতি ও শান্তিতে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে। মোট ছয়টি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানী জন জে হপফিল্ড ও কানাডিয়ান বিজ্ঞানী জেফরি ই হিন্টন। কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মেশিন লার্নিং সম্ভব করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

রসায়নে এবারের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে প্রোটিন গবেষণার জন্য। কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইনের জন্য এই পুরস্কারের অর্ধেক পেয়েছেন মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিড বেকার। আর প্রোটিনের গঠন অনুমানের জন্য বাকি অর্ধেকটা পেয়েছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডেমিস হ্যাসাবিস ও মার্কিন বিজ্ঞানী জন এম জাম্পার।

চিকিৎসাবিজ্ঞান বা শারীরতত্ত্বে নোবেল পেয়েছেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন। মাইক্রোআরএনএ (microRNA) আবিষ্কার ও ট্রান্সক্রিপশন-পরবর্তী জিন নিয়ন্ত্রণে এর ভূমিকা নিয়ে গবেষণার জন্য তাঁরা এ পুরস্কার পান।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন দক্ষিণ কোরিয়ার লেখক হান কাং। হান কাংয়ের লেখায় মানবজীবনের দুঃখ-কষ্টের নানা দিক ও ইতিহাসের সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবন ও অনুভূতিগুলো খুব তীক্ষ্ণ ও কাব্যিকভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি। হান কাং এশিয়ার প্রথম নারী লেখক, যিনি নোবেল পুরস্কার জিতেছেন।

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক ড্যারন আসেমোগলু ও সিমন জনসন এবং ইউনিভার্সিটি অব শিকাগোর অধ্যাপক জেমস এ রবিনসন। 'ঔপনিবেশিক শাসনের সময় প্রবর্তিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলো বর্তমানে অনেক দেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দারিদ্র্যের মূল কারণ হিসেবে কাজ করে'—এ বিষয়ে গবেষণার জন্য তাঁরা তিনজন যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

শান্তিতে নোবেল পেয়েছে জাপানের নিহন হিদানকায়ো সংস্থা। পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে ও পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়াবহ পরিণতি বিশ্ববাসীকে দেখানোর জন্য নিহন হিদানকায়োর অবিরাম প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এই সংগঠন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা হামলায় বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে কাজ করে।

১৯ নভেম্বর, রাফায়েল নাদালের অবসর

২১ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার শেষে র‍্যাকেট তুলে রাখার ঘোষণা দিলেন স্প্যানিশ কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল। এ বছরের অক্টোবর মাসেই আনুষ্ঠানিকভাবে অবসরের ঘোষণা দেন তিনি। ডেভিস কাপ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্যারিয়ারের ইতি টেনেছেন তিনি। ডেভিস কাপে নেদারল্যান্ডসের বটিচ ফন ডি জান্ডশুল্পের কাছে হেরেছেন ৬-৪, ৬-৪ গেমে। নিজের দেশে নিজের সতীর্থদের সঙ্গে এটাই ছিল তাঁর শেষ ম্যাচ। ডেভিস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যাওয়ায় এখানেই সমাপ্তি হলো নাদালের টেনিস ক্যারিয়ারের।

৬ নভেম্বর, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রে চার বছর পরপর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। ইলেকটোরাল কলেজ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজন হয় ২৭০ ইলেকটোরাল কলেজের ভোট। এই ম্যাজিক ফিগার অতিক্রম করে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট। ৫ নভেম্বর, মঙ্গলবারের নির্বাচনে জিতে তিনি হতে যাচ্ছেন সবচেয়ে বেশি বয়সে নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর বয়স এখন ৭৮ বছর। এর আগে জো বাইডেন ৭৭ বছর বয়সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

শুধু তা-ই নয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প হলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত হয়েছেন। এবারের নির্বাচনে ট্রাম্প ৬০ বছর বয়সী কমলা হ্যারিসকে হারিয়েছেন। এর আগে ২০১৬ সালে তিনি আরেক নারী প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে প্রথমবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন।

কিআ প্রতিবেদক

এ ছাড়া আরও অনেক বড় বড় ঘটনা ঘটেছে বিশ্বজুড়ে। ডিসেম্বর মাসেও ঘটবে নানা কিছু। তবে সব ঘটনাকে এখানে জায়গা দেওয়া গেল না। নতুন ঘটনা জানতে চোখ রাখো কিশোর আলো ডটকমে।

দুনিয়া বদলানো ১২ উদ্ভাবন

আহমাদ মুদ্দাসসের

এই তালিকায় জায়গা পাওয়া উদ্ভাবনগুলো নিশ্চিতভাবে বিশ্বকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। এগুলো মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে অসম্ভব ক্ষমতা, জীবনকে করেছে একটু বেশিই সহজ। এ তালিকায় যেগুলো আছে, এর বাইরে নিশ্চয়ই সেরা কিছু উদ্ভাবনের কথা বলা যায়। উদ্ভাবনগুলো তোমার কাছে সেরা মনে হয় কি না, মিলিয়ে নাও।

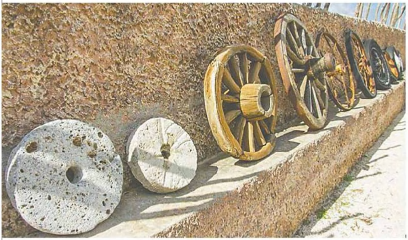

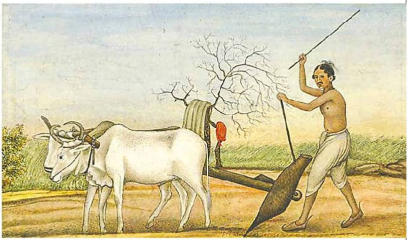

চাকা

সবখানেই এখন চাকা বা হুইল আছে। গাড়িতে আছে, শত শত যন্ত্রে আছে। চাকার কথা ভাবলেই মনে হয়, গাড়ি চলাচলের জন্যই বুঝি চাকা আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে মজার বিষয় হলো, ইতিহাসবিদেরা বলেছেন, প্রথম চাকাগুলো কোনো পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হয়নি। প্রমাণ পাওয়া গেছে, প্রথম চাকা ছিল কুমারের চাকা। মাটির বাসন বানান যিনি, তাঁকে বলে কুমার। তিনি চাকার মাধ্যমে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাটির পাত্রকে আকৃতি দিতেন। ৩ হাজার ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে মেসোপটেমিয়ায় প্রথম চাকা তৈরি হয়। এর প্রায় ৩০০ বছর পর রথের জন্য চাকা ব্যবহৃত হয়েছিল।

লাঙল

জমিতে ফসল কাটার পর আবার চাষ দেওয়া হয়। চাষের জন্য লাঙল ব্যবহার করে মাটিকে কিছুটা ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এতে নিচের মাটি চলে আসে ওপরে, ওপরের মাটি চলে যায় নিচে। লাঙলের কারণেই এটি খুব সহজে করা সম্ভব হয়। একই সঙ্গে ঘাস, আগের ফসলের গোড়া ও ছোট গাছপালা চলে যায় মাটির নিচে। এগুলো পচে সার তৈরি হয়। এতে নতুন ফসল আরও পুষ্টি পায়। যখন গরু, মহিষ, ঘোড়ার মতো কোনো প্রাণী দিয়ে লাঙল টানা শুরু হলো, তখনই খাদ্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে উন্নত হলো। এ ক্ষেত্রে পুরো কৃতিত্ব দেওয়া যায় লাঙলকে।

ছাপাখানা

১২২১ সালে চীনে প্রথম কাঠের টাইপ সাজিয়ে বই ছাপানো হয়। এরপর চৌদ্দ শতকের শুরুর দিকে জোহানেস গুটেনবার্গ প্রিন্টিং প্রেস ও অক্ষরগুলো পরপর সাজিয়ে (চলমান টাইপ) ছাপপদ্ধতি আবিষ্কারের আগে বই বা অন্যান্য নথি হাতে লেখা হতো। ছাপাখানা যখন আবিষ্কৃত হয়ে গেল, যান্ত্রিকভাবে ছাপার কাজ শুরু হওয়ায় প্রচুর বই ছাপা হতে লাগল। বইয়ের সংখ্যা ছাপাখানা আবিষ্কারের ১০০ বছরের মধ্যে বেড়ে দাঁড়াল দুই কোটি কপি। এরপর মাত্র ২০ বছরে বই বেড়ে দাঁড়াল ২০ কোটির বেশি। বই ছাপানোর এই বিস্ফোরণ বিশ্বজুড়ে সাক্ষরতা ও জ্ঞানের বিস্তার একদম সহজ করে তুলল।

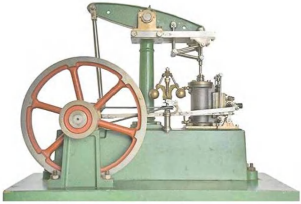

বাষ্প ইঞ্জিন

বাষ্প ইঞ্জিন মনে হয় সবচেয়ে শক্তিশালী আবিষ্কার। বাষ্পশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করার উপায় যখন মানুষ খুঁজে পেল, দুনিয়া বদলে গেল। শিল্পযুগ শুরু হলো। ১৭৮১ সালে জেমস ওয়াট বাষ্প ইঞ্জিন উদ্ভাবন করেন। তবে খ্রিস্টপূর্ব ৩০ থেকে ১৫ অব্দে 'এওলিপাইল' নামে প্রথম বাষ্প ইঞ্জিনের কথা পাওয়া যায়। বাষ্প ইঞ্জিন প্রথমে ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির। শক্তি ছিল কম। মাত্র ১০ অশ্বশক্তি। এক যুগ পর এই শক্তি বেড়ে গেল এক হাজার গুণ। ১০ হাজার অশ্বশক্তি! প্রতিবছরে বেড়ে যাওয়ার হার ছিল দ্বিগুণ!

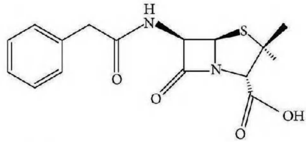

পেনিসিলিন

ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের বিরুদ্ধে কাজ করা প্রথম ওষুধ ছিল পেনিসিলিন। এমনকি রোগের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত প্রথম আধুনিক ওষুধগুলোর মধ্যেও একটি পেনিসিলিন। পেনিসিলিন সভ্যতাকে উন্নত করেছে, বাঁচিয়েছে অসংখ্য জীবন। ১৯২৮ সালে নোবেল বিজয়ী স্কটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বেশি পরিমাণে পেনিসিলিন উৎপাদন করা খুব কঠিন ছিল। প্রথম যে রোগীকে ১৯৪২ সালে পেনিসিলিন দেওয়া হয়েছিল, তাঁকে মোট উৎপাদনের অর্ধেকই দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এরপর সহজ উৎপাদনপ্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৫ সালে প্রতিবছর ৬৪৬ বিলিয়ন ইউনিট পেনিসিলিন উৎপাদিত হয়েছিল।

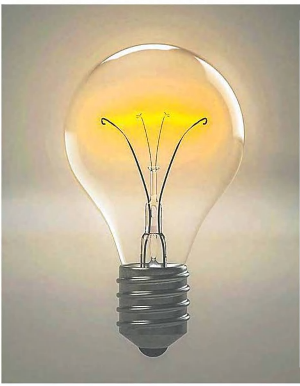

বাল্ব

একটি পাত্র, তেল, চর্বি ও এক টুকরা সুতা দিয়ে তৈরি করা ল্যাম্প ইতিহাসের বেশির ভাগ সময়জুড়ে মানুষকে আলো দিয়েছে। যাকে তোমরা কুপিবাতি হিসেবে চেনো। এই আলো চারপাশকে খুব আলোকিত করতে পারে না। আধো অন্ধকার থাকে। রাতে এই আলো দিয়ে মানুষ দিনের মতো স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারেনি। দুর্ঘটনার হারও ছিল বেশি। কুপির আগুন থেকে আগুন লেগে পুরো বাড়ি জ্বলে গেছে—এমন ঘটনা ইতিহাসে প্রচুর। তবে বিদ্যুৎ উদ্ভাবনের পর টমাস আলভা এডিসন বৈদ্যুতিক বাল্ব বা টাংস্টেন বাল্ব যখন আবিষ্কার করলেন, তখন শুরু হলো আলোর নিরাপদ ও বৈপ্লবিক ব্যবহার। মানুষ আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখল। ছোট্ট একটা কাচের গোলকের মধ্যে একটু তার। সেটা উত্তপ্ত হয়ে আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই আলোতে রাতের অন্ধকার দূর হয়ে গেল। এখন পৃথিবীর সবখানে রাতকে আলোকিত করে দিনের মতোই কাজকর্ম করা যায়। যেমন তুমি যদি রাতে এ লেখা পড়ো, সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ, তোমার কাছাকাছি একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বলছে!

টিকা

আমাদের চারপাশে কতশত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও নানা রকম রোগ ঘুরে বেড়ায়। শরীর নিজের প্রতিরোধক্ষমতা দিয়ে এর বিরুদ্ধে লড়াই করে। মাঝেমধ্যে লড়াইয়ে জিততে দেরি হয়, আমরা আক্রান্ত ও অসুস্থ হই। একসময় সেরে উঠলেও আমাদের শরীরে প্রভাব ফেলে এসব রোগ। টিকা হলো এমন এক আবিষ্কার, যা ভবিষ্যতে যখন রোগের মুখোমুখি হব, তখন শরীর যেন সেই রোগকে চিনতে পারে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে পারে, অর্থাৎ ওই ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়ার সঙ্গে আগেই শরীরকে পরিচিত করে তোলে টিকা। টিকা রোগ শনাক্ত করে এবং ধ্বংস করতে প্রস্তুত থাকে। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন টিকা অনুমোদন দেয়। কোভিড টিকা সম্ভবত সবচেয়ে পরিচিত।

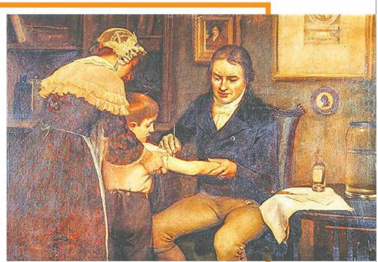

রেডিও

মার্কনি ১৯০০ সালের কয়েক বছর আগে রেডিওর পেটেন্ট নিয়েছিলেন। তবে জগদীশচন্দ্র বসু এর অনেক আগেই বেতারের ধারণা নিয়ে কাজ করছিলেন। মার্কনি রেডিও তরঙ্গ প্রেরণের জন্য বসুর গ্রাহক যন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। ১৯২০-এর দশক পর্যন্ত সংবাদ প্রচার ও বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে রেডিও যথেষ্ট ভালো কাজ করেনি। যদিও টেলিগ্রাফ দিয়ে দীর্ঘ দূরত্বে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ তৈরি করা গিয়েছিল। তবে রেডিও দিয়ে সরাসরি কথা বলার জন্য কিছুকাল মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। রেডিও কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা দিয়েছে মানুষকে। এর আগে মানুষ ঘোড়ায় চেপে বা দৌড়ে গিয়ে খবর পৌঁছে দিত। এই বিভাগে টেলিফোন রেডিওর তুলনায় উন্নত যোগাযোগ দিয়েছে। টেলিফোন মুখে যোগাযোগ সম্ভব করে তুলেছিল। যাকে বলে দ্বিমুখী যোগাযোগ। এটি মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছিল। দূর থেকে মানুষ মাকে ফোন করে বলতে পারত, মা, তোমাকে ভালোবাসি।

বাড়তি যে আবিষ্কার সবকিছু বদলে দিয়েছে, তার নাম ইন্টারনেট বা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ইন্টারনেটের কারণে মানুষের ওর্থ বা দাম বেড়ে গেছে। যাকে বলা যায় উপযোগিতা। মানুষের সক্ষমতা প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে ইন্টারনেট। এতে কোটি কোটি মানুষের জীবন সহজ হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ থাকা মানে যেকোনো জায়গায় সীমাহীন তথ্যভান্ডারের অ্যাকসেস পাওয়া। যে কাউকে আরও বেশি ক্ষমতা এবং বৃহত্তর জগৎকে এনে দিয়েছে হাতের মুঠোয়। ইন্টারনেট আসার ১০ বছর আগে সবচেয়ে শক্তিশালী মিডিয়ার যে শক্তি ছিল, একজন সাধারণ মানুষের হাতে এর চেয়ে বেশি শক্তি ও ক্ষমতা তুলে দিয়েছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের প্রভাব যে প্রায় অকল্পনীয়, তা এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিষয়ে জানতে গেলেই যে কেউ বুঝতে পারবে।

এ তো গেল সাধারণ একটি তালিকা, যেগুলো দুনিয়াকে বদলে দিয়েছে। তোমার মতে দুনিয়া বদলে দেওয়া আবিষ্কার কোনগুলো?

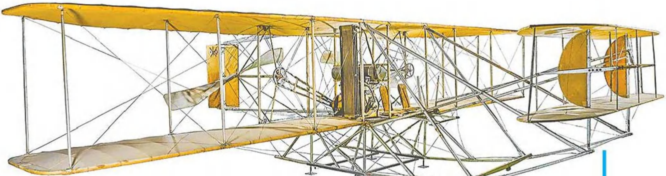

বিমান

সুযোগ পেলে একবার নর্থ ক্যারোলাইনার কিল ডেভিল হিলে ঘুরে এসো। সেখানে ১৯০৩ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম নিয়ন্ত্রিত বাতাসচালিত বিমান উড্ডয়ন করেছিলেন। ঘাসে ঢাকা বালুর মাঠের মধ্যে তাঁদের প্রথম কয়েকটি ফ্লাইটের দূরত্ব মার্কার দিয়ে এখনো দেখানো আছে। হাজার মাইল দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে বিমান। বিশ্বাস করা কঠিন, মাত্র ৫০ বছরের একটু বেশি সময় পর বোয়িং-৭০৭ আকাশে উড়েছে। আর রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রথম উড্ডয়নের ঠিক ৬৬ বছর পর ১৯৬৯ সালে অ্যাপোলো-১১ চাঁদে অবতরণ করেছে। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপার।

অ্যানেসথেসিয়া

এখন হয়তো বিশ্বাস করা কঠিন, অ্যানেসথেসিয়া আঠারো শতকের প্রথম দশকের মাঝামাঝি সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল। অ্যানেসথেসিয়া আবিষ্কারের আগে কী দিয়ে মানুষকে অজ্ঞান করা হতো, তা আমরা সঠিক জানি না। একটা অপারেশন বা আঘাতের পর রোগীকে সুস্থ করার প্রক্রিয়ায় মানুষ কতটা কষ্ট পেয়েছে, সঠিকভাবে জানার জন্য সে সময়ের কেউ বেঁচে নেই। সেই সময়ের কোনো সার্জন বা ডেন্টিস্টের কাছ থেকে বিষয়টা জানতে হয়তো আমাদের সময় ভ্রমণের প্রয়োজন হবে।

ফ্লাশ টয়লেট

নিক ভেলারি *দ্য ইকোনমিস্ট*-এ একটি লেখা লিখেছিলেন, যেখানে তিনি ফ্লাশ টয়লেট বা হাই কমোডকে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের চেয়ে আরও অলৌকিক বলে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, 'মানুষের বর্জ্যনিষ্কাশনের জন্য বাড়ির মধ্যে স্যানিটেশনের ব্যবস্থা না থাকলে আমরা এখনো কলেরা, আমাশয় ও টাইফয়েডের নির্মম যুগে বাস করতাম। অনেকগুলো প্লেগ থেকে মুক্তি দিয়েছে এই আবিষ্কার।'

টয়লেটের প্রাচীনতম ভার্সনেও ফ্লাশ করার জন্য পানি ব্যবহার করা হতো। নদীর স্রোতে বর্জ্য প্রবাহিত করে দিলে সেই বর্জ্য দূরে চলে যেত। কিন্তু এতে নদীও দূষিত হতো। যেখানে নদী নেই, সেখানে বর্জ্য নিয়ে বিপদ ছিল।

কম্পিউটার

তুমি কি কম্পিউটার ব্যবহার করো? সম্ভাবনা আছে, জন্ম থেকেই তুমি তোমার বাসায় কম্পিউটার দেখছ। লেখালেখি থেকে শুরু করে এমন কোনো কাজ নেই, যা এখন করতে কম্পিউটার ব্যবহৃত হয় না। অনেকের জীবনটাই হয়তো আটকে গেছে কম্পিউটারে। পড়াশোনা, খেলা, সময় কাটানো থেকে শুরু করে গাড়ি চালাতেও এখন কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়। একটা কিছু জানার দরকার পড়লে কম্পিউটার বা ফোন থেকে সার্চ করলেই গুগল উত্তর বের করে দেয়। ফোন কিন্তু একটা ছোটখাটো কম্পিউটার। শুরুতে কম্পিউটার ছিল একটা বিরাট বস্তু। ছোট একটা ঘর বা বিশালাকার জেনারেটরের মতো।

খুব দ্রুত এর আকার ছোট হতে লাগল। এখন যাকে আমরা বলি পিসি বা পারসোনাল কম্পিউটার, এর উত্থান দেখে যে কারও অবিশ্বাস্য লাগবে। এক কম্পিউটার কাজের ধারণাকে এমনভাবে বদলে দিয়েছে, এখন আর কাজ মানে এক বস্তুর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরানো নয়। এখন কাজ কি-বোর্ডে চেপে চেপে দারুণ কিছু করে ফেলা। যোগাযোগের ধারণাকে এই কম্পিউটার অসম্ভব রকম বদলে দিয়েছে। এ নিয়ে নতুন কিছু বলার নেই।

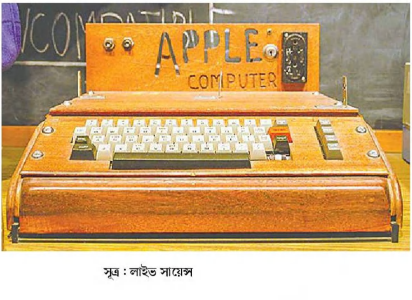

সূত্র : লাইভ সায়েন্স

ধলেশ্বরীর তীরে বিজ্ঞানবাক্স টিম

গত মাসে আমরা গিয়েছিলাম মুন্সীগঞ্জ জেলায়। ধলেশ্বরীর তীরে অবস্থিত মুন্সীগঞ্জের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে আয়োজন করা হয়েছিল বিজ্ঞান উৎসবের। চমৎকার দুটি দিন কেটেছে সেখানে আমাদের। স্কুল প্রাঙ্গণ যেন পরিণত হয়েছিল এক আনন্দমেলায়! শিক্ষার্থীরা তো ছিলই, শিক্ষক এবং অভিভাবকেরাও অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে অংশ নিয়েছিলেন। ফলাফল, একটা জমজমাট ইভেন্ট!

আমাদের এক্সিবিশন বুথে ছিল দারুণ ভিড়! আগ্রহ আর বিস্ময় নিয়ে নানা ক্লাসের নানা শিক্ষার্থী আসছিল। বিজ্ঞানবাক্স টিমের সদস্যরা তাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল ক্লান্তিহীনভাবে। সাথে হাতে-কলমে দেখাচ্ছিল চুম্বক, তড়িৎ, রসায়নের নানারকম এক্সপেরিমেন্ট।

এই দুইদিনে অনেক অনেক শিক্ষার্থী এসেছে আমাদের কাছে, অনেক গল্প হয়েছে তাদের সাথে, জমা হয়েছে অনেক স্মৃতি। সবার নাম আমাদের পক্ষে মনে রাখা সম্ভব হয় নি, আর সবার গল্পও এই ছোট্ট পরিসরে বলা সম্ভব নয়। তবে শোয়াইবের গল্পটা তো বলাই যায়!

প্রথম শ্রেণির ছাত্র শোয়াইব ক্লাস শেষ করে ইউনিফর্ম বদলেই দৌড়ে আসত আমাদের এক্সিবিশন বুথে। শোয়াইবের মা-বাবা দুজনেই ঐ স্কুলেরই শিক্ষক। তারাও শোয়াইবের এই আগ্রহকে মূল্য দিয়েছেন। শোয়াইবকে উৎসাহিত করেছেন উৎসব প্রাঙ্গনে আসতে এবং সাথে থেকেছেন। শোয়াইব প্রতিটা বিজ্ঞানবাক্স খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে, তারপর বেছে নিয়েছে তার পছন্দেরটা। চুম্বকের নানা কারিকুরি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে চুম্বকের চমক বিজ্ঞানবাক্সটাই পছন্দ করে। তো, এটাই হলো তার পছন্দের বিজ্ঞানবাক্স।

শেষ দিনে সে আরেক কাণ্ড করে বসল। বলল, "বিজ্ঞানবাক্সের টিমের সাথে ছবি না তুলে আমি বাসায় ফিরব না।" শোয়াইবের এই অনুরোধ কি ফেলা যায়? সুতরাং ছবি তুলতেই হলো!

আমাদের মনে থাকবে ছোট্ট আজমার কথাও। সে এসেছিল তার পছন্দের মহাকাশের জগৎ বিজ্ঞানবাক্স নেয়ার জন্য। আজমার বড় ভাই আয়ানও এই স্কুলেরই একজন ছাত্র। সে আগের দিন তড়িৎ তাণ্ডব বিজ্ঞানবাক্স নিয়েছিল। বড় ভাইয়ের মুখে বিজ্ঞানবাক্সের গল্প শুনে এবং তাকে বিজ্ঞানবাক্সের নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতে দেখে আজমার মনে হলো তারও একটা চাই! তাই পরের দিন আজমা তার আম্মুকে নিয়ে আসে। বিজ্ঞানবাক্স কেনার জন্যে

আজমা তার মাটির ব্যাংক ভেঙে জমানো টাকা নিয়ে এসেছিল। আজমা যেমন আমাদের এমন চমৎকার একটা স্মৃতি উপহার দিয়েছে, আমরা আশা করি বিজ্ঞানবাক্স ব্যবহার করে তার জীবনেও এমন চমৎকার সব স্মৃতি তৈরি হবে এবং সে আরো নতুন কিছু করার উৎসাহ পাবে।

শোয়াইব ও আজমার মতো এরকম অনেক শিক্ষার্থী অসাধারণ সব মুহূর্ত উপহার দিয়েছে আমাদের। তবে বলতে হয় অভিভাবকদের কথাও। আমাদের উত্তর দিতে হয়েছে তাদের কৌতূহলী প্রশ্নেরও। কোন বয়সের জন্যে কোন বিজ্ঞানবাক্স ভালো হবে, কোন কোন বিষয়ের বিজ্ঞানবাক্স আছে, তাতে কী কী এক্সপেরিমেন্ট, এমন কত প্রশ্ন তাদের! আশা করি ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের সাথে হোম ল্যাবরেটরিতে তাদের চমৎকার সময় কাটবে।

আর শিক্ষকদের কথাও না বললেই না। আয়োজনটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের কাছ থেকে সহায়তা পেয়েছি। শিক্ষার্থীরা যেন হাতে-কলমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় করে দেখতে পারে, এই ব্যাপারে তারা খুবই সচেতন ছিলেন। এই চমৎকার স্কুলটিতে আমরা সময় ও সুযোগ পেলে আবার আসতে চাই।

স্কুলে স্কুলে গিয়ে আমরা এমন ক্যাম্পেইন আয়োজন করছি, যাতে বিজ্ঞান শিক্ষা আরও আনন্দময় এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। আমরা চাই, প্রতিটি শিশু বিজ্ঞানকে ভয় নয়, ভালোবাসার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করুক।

স্কুলে স্কুলে আমরা এমন আয়োজন করে আসছি অনেক দিন ধরেই। প্রায় ১০ বছরে ২০০০+ স্কুলে বিজ্ঞানবাক্সের ক্যাম্পেইন করা হয়েছে। বিজ্ঞানবাক্সের সাথে বিজ্ঞান শেখার এই স্মরণীয় অভিজ্ঞতাটি তুমিও নিশ্চয়ই মিস করতে চাইবে না? তোমাদের স্কুলেও এমন একটা আয়োজন হলে মন্দ হয় না, কী বলো!

তোমার স্কুলেও অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স টিমকে চাও? তাহলে যোগাযোগ করো আমাদের সাথে।
যোগাযোগের নাম্বার- ০১৭০৮১৬৬১৪১

অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপে যোগ দিতে
এই কিউ আর কোডটি স্ক্যান করো-

বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে

স্বপ্ন
meena bazar
bringing freshness to your life
রকমারি .com
www.rokomari.com

এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং
bigganbaksho.com

অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স

ধনী হওয়ার মজার খেলা

১
শুরু

২
ওয়াও! তুমি ভাগ্যবান। ছক্কাটি আবার চালো।

৩
তোমাকে পুলিশ ধরেছে। ৬ নম্বর ঘরে যাও এবং পরের চাল দিতে পারবে না।

৪
রোবট তোমাকে ধরে রেখেছে। এখান থেকে নড়তে পারবে না।

৫
আহ! তোমাকে এখানেই থামতে হবে। খেলতে চাইলে আবার প্রথম থেকে শুরু করো।

২৮
অভিনন্দন! তুমি এখন কোটিপতি।

২৭
একবার চাল দিতে পারবে না।

২৬
জাদুর ঘোর এখনো কাটেনি। ২ বার দাম দিতে পরবে না।

২৫
চুপচাপ বসে থাকো।

২৪
ডাইনোসর ধরবে। ২ ঘর পেছনে যাও।

২৩
চুপচাপ বসে থাকো।

২২
দারুণ! নতুন গাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে ২৫ নম্বর ঘরে যাও।

২১
নো! বেলুনটি ফাটিয়ে ফেলেছ। ৩ ঘর পেছনে যাও।

২০
প্রজাপতি তোমার ভাগ্য ভালো করতে পারেনি। ২ ঘর পেছনে যাও।

যেভাবে খেলবে

খেলাটি বেশ সহজ। তোমার সঙ্গে আরও এক বা একাধিক সঙ্গী লাগবে। আর লাগবে একটা লুডোর ছক্কা এবং যতজন খেলবে, ততটি ঘুঁটি। আলাদা রঙের বোতাম হলেও চলবে। তুমি যাতে বুঝতে পারো, এই ঘুঁটি বা বোতামটি তোমার। এগুলো হলেই তুমি খেলাটি শুরু করতে পারবে। লুডোর ছক্কায় যত দাম পড়বে, তুমি তত ঘর সামনে যাবে এবং ওই ঘরে যা লেখা থাকবে, সে অনুযায়ী কাজ করবে। এভাবে যে সবার প্রথমে কোটির ঘরে (২৮ নম্বর) পৌঁছাতে পারবে, সে হবে জয়ী।

৬
একবার চাল দিতে পারবে না।

৭
আর্মি! দ্রুত দুই ঘর সামনে যাও।

৮
ওয়াও! লটারি জিতেছ। ২০ নম্বর ঘরে যাও।

৯
একবার চাল দিতে পারবে না।

১০
বাহ্! আবার চাল দাও।

১১
পড়েছ মোগলের হাতে, খেতে হবে সাথে। এখান থেকে নড়তে পারবে না।

১২
আরেহ চমৎকার! দ্রুত ১৭ নম্বর ঘরে যাও।

১৩
চুপচাপ বসে থাকো।

১৪
জাদুকরের হাতে পড়েছ। জাদুকর তোমাকে ২৩ নম্বর ঘরে পাঠিয়েছে।

১৫
ড্যান্স মোড। আবার চাল দাও।

১৬
বুদ্ধি খাটাও। একটা সংখ্যা ভাবো। অন্যরা যদি তোমার ভাবা সংখ্যাটা বলতে পারে, তাহলে তারা ১৯ নম্বর ঘরে যাবে। আর সবাই ব্যর্থ হলে তুমি যাবে।

১৭
চুপচাপ বসে থাকো।

১৮
একবার চাল দিতে পারবে না।

১৯
তোমার প্রতিবেশীর বিয়ে। এই খুশিতে আবার দাম দাও।

ব্লুই ম্যাগাজিন অবলম্বনে

যা ভাবছ, তা তা না

জাহিন যাঈমাহ্ কবির

আনারস খেয়ে দুধ খেলেই নাকি নিশ্চিত মৃত্যু! আবার বেশি কাছ থেকে টেলিভিশন দেখলে নাকি অল্প দিনেই চোখ নষ্ট—ছোটবেলা থেকে দাদি-নানি আর মা-বাবার এমন কথা শুনে বড় হই আমরা। তোমরাও নিশ্চয়ই এর ব্যতিক্রম নও। তবে কখনো কি মনে হয়েছে, এসব কথা আদৌ সত্য? আমার কিন্তু মনে হয়েছে। আর তাই কৌতূহল থেকেই নেমে পড়লাম আমাদের আশপাশের প্রচলিত এমন সব মিথের সত্যতা যাচাইয়ে। তারপর যা খুঁজে পেলাম, তা দেখে তো আমার মাথায় হাত! আমি নিশ্চিত, তোমরা শুনলে তোমাদেরও একই দশা হবে। ভাবছ, কী এমন জানলাম? তাহলে বলি তোমাদের। তবে তার আগে এইটুকু জেনে রাখো, এত দিন ধরে যা ভাবছ, তা কিন্তু তা না!

যা জানো : বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে সব হারিয়ে যায়

ঘটনা আসলে যা : এটা একটা প্রচলিত গল্প মাত্র। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত *দ্য বারমুডা ট্রায়াঙ্গল* নামের বইটি এই অঞ্চলের এই নাম এবং এখানে সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার প্রচলিত গল্পের প্রচলন ঘটায়।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে কিছু জাহাজ বা প্লেন হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস আছে, এটা সত্য। এখানে ঝড়, হারিকেনও হয় প্রচুর। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরের অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানে জাহাজ বা প্লেন হারিয়ে যাওয়ার পরিমাণ বেশি নয়; বরং আটলান্টিক মহাসাগরের সবচেয়ে ব্যস্ত অংশগুলোর একটি এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। প্রতিদিন প্রচুর জাহাজ ও প্লেন বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ওপর দিয়ে চলাচল করে। ২০১৩ সালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ডের গবেষণা অনুযায়ী, পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ১০টি সমুদ্রপথের তালিকা করা হলে তার মধ্যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল থাকবে না।

যা জানো : ব্রেন গেম খেললে মাথা খোলে

ঘটনা আসলে যা : প্লে স্টোরজুড়ে কত কত ব্রেন গেম। সেসবের বর্ণনায় আবার লেখা, এসব গেম আমাদের মানসিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, যার পুরোটা সত্য নয়। মস্তিষ্ক প্রশিক্ষণ দেয়, এমন গেম স্নায়ুকোষের সংযোগ (সিনাপস) বাড়াতে ও শক্তিশালী করতে পারে। তবে এই গেমগুলো নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত ভালো-খারাপ দুই দিকেই আছে। কেউ মনে করেন, এটি যাদের মানসিক দক্ষতা ভালো, তাদের জন্য কার্যকর। আবার অন্যরা মনে করেন, অনেক ব্রেন ট্রেনিং ওয়েবসাইটের দাবি বৈজ্ঞানিকভাবে ভিত্তিহীন।

অপর দিকে বিশেষজ্ঞরা একমত, মানসিক উদ্দীপনামূলক কার্যকলাপ মস্তিষ্কের ক্ষতি করে না, ভুলে যাওয়া রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। তবে মস্তিষ্ক প্রশিক্ষক গেমগুলোর কার্যকারিতা কতটুকু, তা এখনো স্পষ্ট করে জানা যায়নি। এটি ক্ষতি করবে না, তবে এটি সহায়তা করবে, এমন গ্যারান্টিও দেওয়া যায় না।

যা জানো : দুধ আর আনারস একসঙ্গে খেলে নিশ্চিত মৃত্যু!

ঘটনা আসলে যা : দুধ আর আনারস একসঙ্গে কিংবা পরপর খেলে মৃত্যু হবে, এ তথ্যের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। বারডেমের সাবেক প্রধান পুষ্টিবিদ আখতারুন নাহার তা-ই মনে করেন। এ নিয়ে *প্রথম আলো*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে একটি লোককাহিনিও শুনিয়েছিলেন তিনি। সেই কাহিনি অনুযায়ী, একবার আনারসের ঝোপে ঘাপটি মেরে বসে ছিল এক বিষধর সাপ। কোনো একভাবে সেই সাপ তার বিষ ঢেলে দিয়েছিল পাশে থাকা আনারসে। আর সেই আনারস নিয়ে খেয়েছিল এক ব্যক্তি। আনারসের পরই দুধে চুমুক দিয়েছিল সে। আর তারপরই মৃত্যু। আর এর পর থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে দুধ আর আনারস নিয়ে এই ভ্রান্ত ধারণা।

তবে যাদের দুধ হজম হয় না, তাদের দুধ ও আনারস একসঙ্গে খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

যা জানো : মানুষভেদে প্রত্যেকের আঙুলের ছাপ একেবারেই ভিন্ন হয়ে থাকে। একই রকম আঙুলের ছাপের মানুষ পৃথিবীতে বিরল

ঘটনা আসলে যা : বাকি সব স্বাভাবিকভাবে নিতে পারলেও এই তথ্য মেনে নিতে কিন্তু আমার বেশ কষ্ট হয়েছে। এত দিন ধরে যে আমরা জেনে আসছি, মানুষভেদে আঙুলের ছাপ একদমই আলাদা, এ তথ্য পুরোপুরি সত্য নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে তোমার নিকটাত্মীয় অনেকের আঙুলের ছাপের বেশ মিল থাকতে পারে। আঙুলের ছাপের এই পুরো বিষয়টাই বেশ জটিল।

যা জানো : সাদা মানেই সুস্থ দাঁত

ঘটনা আসলে যা : ঝকঝকে সাদা মানেই সুস্থ দাঁত। অন্তত টুথপেস্টের বিজ্ঞাপন তো আমাদের তা-ই বলে। হ্যাঁ, ঝকঝকে সাদা হাসি সুন্দর, তবে সুস্থতার বিষয়ে সত্যিটা কিন্তু একটু ভিন্ন। ঝকঝকে সাদা নয়; বরং হালকা হলুদ রংটাই আমাদের দাঁতের আসল রং। কারও কারও কাছে এই হালকা হলুদ দাঁতকে সমস্যা মনে হতে পারে, যেখানে পুরো বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। বরং এই স্বাভাবিক দাঁতকে ব্লিচিং বা অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দিয়ে ঘষে সাদা বানানোকে অস্বাস্থ্যকর বলা যায়।

যা জানো : চুল ফেলে দিলে, নতুন চুল আরও ঘন ও কালো হয়ে গজাবে

ঘটনা আসলে যা : ছোটবেলায় চুল ছোট করার সময় এলেই মা আমাকে এ কথাই বলতেন, এবার পুরোপুরি ফেলে দিলে নাকি পরেরবার আরও সুন্দর চুল গজাবে। আমি কথাটা মানতে চাইতাম না। কিন্তু তখন আমার মানা না-মানা দিয়ে কি কিছু হতো? তবে আমার ধারণা কিন্তু ভুল ছিল না। তোমরা যদি ভেবে থাকো, আরও সুন্দরের আশায়, এখন যা চুল আছে মাথায়, তা কেটে ফেলবে, তাহলে বলে রাখি, ব্যাপারটা একদমই সে রকম নয়। চুল কেটে ফেলার সঙ্গে তা ঘন কিংবা গাঢ় রঙের হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

যা জানো : হাতিরা কখনো কিছু ভোলে না

ঘটনা আসলে যা : প্রাণিজগতের অন্যতম বুদ্ধিমান প্রজাতি হাতি। যাঁরা হাতি নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন, তাঁদের ভাষ্যমতে জানা যায়, কেউ আঘাত করলে হাতি তাদের কথা মনে রাখে। ক্ষোভ পুষে রাখে মনে। অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা, বিষয়টি হাতিদের বিশাল মস্তিষ্কের সঙ্গে সম্পর্কিত। একটি প্রাপ্তবয়স্ক হাতির মস্তিষ্কের ওজন ১১ পাউন্ডের (প্রায় ৫ কেজি) মতো হয়। সে তুলনায় মানুষের মস্তিষ্কের ওজন হয় ৩ পাউন্ডের (প্রায় দেড় কেজি) মতো। পার্থক্যটা আকাশ-পাতাল! সত্যি বলতে, আর কোনো স্থলজীবী স্তন্যপায়ীর মস্তিষ্কই এত বড় হয় না। এ রকম আরেকটি অন্যতম বুদ্ধিমান প্রাণী ডলফিন। তাদের মস্তিষ্কের ওজনও ও রকম, ৩ পাউন্ডের মতো। শুধু প্রখর স্মৃতিই নয়, অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রাণিজগতের অন্যতম বুদ্ধিমান প্রজাতি হাতি।

যা জানো : আমাদের জিবের একেক অংশ একেক রকম স্বাদ অনুভব করে

ঘটনা আসলে যা : তোমার ধারণাও যদি হয় তা-ই, তাহলে বলে রাখি, জার্মান এক গবেষণার ভুল অনুবাদের কারণে আমরা সবাই এ তথ্য বিশ্বাস করে আসছি। নতুন এক গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের জিবের পুরোটা অংশই ভিন্ন সব স্বাদ অনুভব করতে পারে, সেই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সব স্বাদ শনাক্ত করতে পারে।

কী? এত সব চাঞ্চল্যকর তথ্য একসঙ্গে পেয়ে তুমিও আমার মতো হাঁপিয়ে গেছ? আমরা আসলে এমন অনেক প্রচলিত কথা কিংবা মিথ কোনো প্রমাণ বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ছাড়াই বিশ্বাস করে আসছি। এর মধ্যে অনেক তথ্য যেমন সত্য, তেমনি অনেক ভ্রান্ত ধারণাও রয়েছে। আর এর জন্যই শুরুতে বলেছিলাম, যা ভাবছ, তা তা না!

সূত্র : ক্র্যাকড ডট কম

মনে করা হয়, বিশ্বের সর্বোচ্চসংখ্যক ভেন্ডিং মেশিন রয়েছে জাপানে। প্রায় প্রতি ৪০ জনের জন্য আছে একটি ভেন্ডিং মেশিন।

আঙুলের ছাপের মতো সবার জিবের ছাপও আলাদা। জিবের ছাপ দিয়ে মানুষকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব।

একটি শামুক তিন বছর পর্যন্ত ঘুমাতে পারে।

ফিলিপাইন একটি দ্বীপপুঞ্জ। এই দেশটি ৭ হাজার ৬৪১টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এ ছাড়া অনেক বালুর চর ও ভূমি আছে, যা ভাটির সময় ভেসে ওঠে। সংখ্যায় এগুলো হাজার হাজার, দ্বীপগুলোর হিসাবে এগুলোকে ধরা হয়নি।

উটের প্রতিটি চোখে থাকে তিনটি পাতা। উট যেন মরুভূমির উড়ে আসা বালু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তাই এ ব্যবস্থা।

কুমির জিব বের করতে পারে না।

কেউ নিজের কনুই নিজের জিবে লাগাতে পারে না।

বুলেটপ্রুফ ভেস্ট, ফায়ার এস্কেপ, উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার ও লেজার প্রিন্টার—সব কটির আবিষ্কারক নারী।

অন্যরকম প্রজন্ম উৎসব

অন্যরকম প্রজন্মের কুশীলবেরা

কেমন আছো সবাই? অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্সের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিও। তোমরা তো আমাদের অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপের একটিভিটি সম্পর্কে জানোই, তাই না? অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপের সদস্যরা প্রতি মাসেই ওদের উদ্ভাবনী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানবাক্স এবং বিজ্ঞানবাক্সের বাইরের নানারকম সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টের ভিডিও করে পাঠায় ওরা। প্রতি মাসেই আমরা ওদের ছবি প্রকাশিত হয়ে থাকে কিশোর আলোতে। দেখে নাও ২০শে অক্টোবর থেকে ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত অংশগ্রহণকারীদের নাম ও ছবি।

ওয়াফি, বিশাল, শাহরিয়ার, অহিন, আওরাজ, আনজাম, আনান, আনাস, রিজওয়ান

আফনান, আফিফ, আবিদা, আবুবক্কর, আয়ান, আলভি, আহনাফ, ইব্রাহিম, রিয়াসাত

ইরা, এরিকা, এহসান, ওয়াফী, কীর্তিকা, জাওয়াদ, জামিম, তানহা, রুশদান

তাফহিম, তাফিয়া, তামজিদ, তামিম, তালহা, তাহমিদুল, তাহিম, তৌসিফুল, শিশির

দিব্য, দ্যা স্টারজ, নাইয়ান, নিকিতা, নুজহাত, ফাইজান, ফাহিম, বিজয় ও বিপ্লব, শিহাব

মাহফুজুর, মুকিত, মুত্তাকিন, মুনতাসির, মুয়াজ, মেলিসা, রামীম, হাওয়া, স্বপ্ন

সাফারা ও সুফিয়া, সুফিয়া

তুমিও যোগ দিতে পারো অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স পরিবারে। হতে পারো অন্যরকম প্রজন্মের একজন। অন্যরকম প্রজন্ম গ্রুপে যোগ দিতে এই কিউআর কোডটি স্ক্যান করো-

বিজ্ঞানবাক্স পাওয়া যাচ্ছে

স্বপ্ন | meena bazar bringing freshness to your life | রকমারি.com www.rokomari.com

এছাড়াও নিকটস্থ লাইব্রেরিতে এবং

bigganbaksho.com

অন্যরকম বিজ্ঞানবাক্স

যখন গাড়ি ব্রেক করে, তখন শক্তি কোথায় যায়

জাকারিয়া সুমন

যখন গাড়ির ব্রেক চাপ দেওয়া হয়, গাড়ির গতিশক্তি মূলত ঘর্ষণের কারণে রূপান্তরিত হয় তাপে। তবে নতুন হাইব্রিড বা ইলেকট্রিক গাড়িতে এই শক্তির কিছু অংশ সংরক্ষণ করা হয় ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য।

ধরা যাক, তুমি ১২০ কিমি/ঘণ্টা গতিতে একটি গাড়ি চালাচ্ছ। হঠাৎ ট্রাফিক সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলে উঠল, তখন তুমি কী করবে? তোমাকে দ্রুত ব্রেক চাপতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেমে যাবে। কিন্তু মজার বিষয় হলো একমুহূর্ত আগেও গাড়িতে অনেক শক্তি ছিল, তাহলে সেই শক্তি কোথায় গেল? উত্তরটি বোঝার জন্য আমাদের চলন্ত বস্তুর শক্তি এবং তা কীভাবে থামে, তা বুঝতে হবে।

কাইনেটিক এনার্জি বা গতিশক্তি কী?

একটি চলমান বস্তু কিছু শক্তি ধারণ করে। একটি চলন্ত ফুটবলের কথা ভাবো, যা একটি স্থির ফুটবলের তুলনায় অনেক বেশি শক্তি ধারণ করে; এটি থামবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এই শক্তি হারিয়ে যায়। চলন্ত অবস্থায় কোনো বস্তুর যে শক্তি থাকে, তাকে বলা হয় গতিজনিত শক্তি বা কাইনেটিক এনার্জি।

যখন কোনো খেলোয়াড় তাঁর পা দিয়ে বলটি থামান, তখন বলের শক্তি তাঁর পায়ে সঞ্চারিত হয়। আর কিছু কিছু শক্তি শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। খেয়াল করেছ নিশ্চয়, অনেক সময় গাড়ি ব্রেক করলে অনেক শব্দ হয়।

যখন একটি ক্রিকেট বল বা ফুটবল ঘাসের ওপর দিয়ে যায়, তখন গতিশক্তি ধীরে ধীরে ঘর্ষণের মাধ্যমে ঘাস শোষণ করে নেয়। তবে, এই বলগুলোর শক্তি খুব কম। কিন্তু একটি ভারী গাড়ি অনেক বেশি শক্তি ধারণ করে। তাই এই শক্তি খুব অল্প সময়ে শুধু ঘর্ষণের মাধ্যমে সড়কে বা রাস্তায় স্থানান্তর করা সম্ভব নয়।

তুমি যদি দ্বিগুণ গতিতে চলো, তবে গতিশক্তি চার গুণ বেশি হবে। এসব শক্তি ব্রেক করার সময় নষ্ট করতে হবে, যাতে গাড়িটি থামতে পারে। ও আরেকটা ব্যাপার হয়তো জানো, শক্তি কখনোই ধ্বংস বা বিলুপ্ত হয় না, কেবল এর রূপ পরিবর্তিত হয়।

ব্রেক কীভাবে শক্তি রূপান্তর করে?

গাড়ি চালানোর শক্তি আসে পেট্রল বা গ্যাসোলিন থেকে, যা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খরচ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যে কাজটি হয়, তা হলো শক্তির একটি রূপান্তর—পেট্রলের রাসায়নিক শক্তি থেকে গাড়ির গতিশক্তি। গাড়ি থামানোর সময়, এই গতিশক্তি অন্য রূপে রূপান্তর করতে হয়, যেটা ঘটে তাপের মাধ্যমে।

অবশ্য বেশির ভাগ গাড়িতে ডিস্ক ব্রেক ব্যবহৃত হয়। আপনি যখন ব্রেক চাপেন, তখন একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা ব্রেক রোটরকে চেপে ধরে, এই রোটর গাড়ির চাকায় যুক্ত থাকে। এই চাপটা অনেক ঘর্ষণ এবং চাকার গতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি করে। এর ফলে ব্রেক চাপলে রোটর ও প্যাডের মাধ্যমে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়।

শক্তির রূপান্তরটা কীভাবে হয়?

একেক বাহনের ব্রেক একেক রকম হয়, যেমন ট্রাকে এয়ার ব্রেক, আধুনিক গাড়িতে ডিস্ক ব্রেক এবং সাইকেলে রিম ব্রেক। এগুলো আলাদা হলেও ঘর্ষণের মাধ্যমে গতিশক্তিকে তাপে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটা কিন্তু একই রকম।

সাইকেলে দীর্ঘ সময় ধরে ব্রেক চাপার পর রিম গরম হয়ে যায়, যেটা তুমি নিজেই অনুভব করতে পারবে।

গাড়ির ক্ষেত্রে ব্রেক করার ফলে সৃষ্ট তাপ কয়েক শ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, তা কি জানো? বিশেষ করে ফর্মুলা ওয়ান গাড়ির ব্রেক প্যাড বিশেষ উপাদানে তৈরি, যা প্রচুর বাতাস প্রবাহিত হতে দেয় এবং দ্রুত তাপ অপসারণ করে।

হঠাৎ ব্রেক করার সময় গাড়ির ব্রেক থেকে শব্দও হয়, যা শক্তিটা শব্দশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার একটি উদাহরণ।

শক্তি পুনরায় ব্যবহার করা সম্ভব কি?

গাড়ির গতিশক্তি ব্রেক চাপ দিলে পরিবেশে হারিয়ে যায়। তবে রিজেনারেটিভ ব্রেকিং আসার কারণে এই ঘটনায় নতুন পালাবদল এসেছে।

হাইব্রিড বা ইলেকট্রিক গাড়িতে, চলন্ত গাড়ির শক্তি মোটরকে একটি জেনারেটরে রূপান্তরিত করে ব্যাটারিতে ফিরিয়ে আনা হয়। চাকার গতিশক্তি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং ব্যাটারিতে সংরক্ষণ করা হয়। তবে রিজেনারেটিভ ব্রেকিং ব্যবস্থায়ও অন্তত ৩০% শক্তি তাপ হিসেবে পরিবেশে নষ্ট হয়।

আমাদের উদ্ভাবন বা আবিষ্কার চলতে থাকবে, ব্রেক উন্নত হবে এবং গাড়ির ইঞ্জিন আরও আধুনিক হবে। তবে এটি সব সময় সত্য যে শক্তি কখনোই ইঞ্জিনে 'সৃষ্টি' হয় না এবং ব্রেকে 'নষ্ট' হয় না।

সূত্র : **সায়েন্স এবিসি**

• শব্দের খেলা

শব্দভেদ

শব্দভেদ মেলানোর নিয়ম জানা আছে নিশ্চয়ই। বাঁ থেকে ডানে এবং ওপর থেকে নিচে দেওয়া থাকে সংখ্যা। আর এসব সংখ্যা অনুযায়ী দেওয়া থাকে সংকেত। সে অনুযায়ী শব্দ খুঁজে বের করে ফাঁকা ঘরে বসালেই হয়ে যায় শব্দভেদ। শব্দভেদ মিলিয়ে শিখতে পারবে নতুন নতুন শব্দ। সেই সঙ্গে হয়ে যাবে বুদ্ধির পরীক্ষাও। তোমাদের জন্য শব্দভেদ বানিয়েছেন **সুমন মাহমুদ**

১	২		■	৩	৪		৫
৬		■	৭			■	
	■	৮	■		■	৯	
১০	১১		১২	■	১৩		■
■		■	১৪	১৫	■	১৬	
১৭		১৮	■	১৯	২০		■
	■	২১		■		■	২২
■	২৩		■	২৪			

বাঁ থেকে ডানে

১. গগন। ৩. উপেক্ষা, অবজ্ঞা। ৬. সম্মত, মেনে নেওয়া হয়েছে এমন। ৭. বাহবা, প্রশংসাসূচক উক্তি। ৯. অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা। ১০. নগরবাসী। ১৩. পরাস্ত, দুর্বল। ১৪. মৌ। ১৬. গাঢ় বেগুনি রঙের ফল। ১৭. বকুনি, তিরস্কার। ১৯. স্বল্প লাল আভাযুক্ত। ২১. ভারহীন, হালকা। ২৩. মূল্য, দর। ২৪. অবিরাম জলপ্রবাহের বা জল নির্গমনের শব্দ।

ওপর থেকে নিচে

১. উপাসনা, প্রার্থনা। ২. যিনি মুসলমানদের বিয়ে রেজিস্ট্রি করেন। ৩. বাক্যহীন, বিস্ময়ে নির্বাক। ৪. অধীন, আয়ত্ত। ৫. নিরুদ্দেশ, নিখোঁজ। ৮. বিলম্ব। ৯. সবুজ আভাযুক্ত। ১১. উষ্ণ, তপ্ত। ১২. সংখ্যায় বা পরিমাণে অল্প। ১৫. ধূলি, শুকনা মাটির গুঁড়া। ১৭. বিত্তশালী, ধনবান। ১৮. লেখনী, যা দিয়ে লেখা হয়। ২০. জমি চাষ করার যন্ত্র। ২২. বছর।

গত সংখ্যার উত্তর

পা	নি	■	ঝাঁ	কা	নো	■	ক্ষ
■	ম	গ	জ	■	ন	র	ম
প	■	ম	■	আ	তা	■	তা
রি	ক্ত	■	পে	শা	■	সা	■
তা	■	পা	ট	■	ম	রি	চ
প	ল	কা	■	ব্য	স্ত	■	তু
■	হ	■	ক্ষ	য়	■	ব্য	র্থ
জা	মা	ন	ত	■	মা	থা	■

জানো তো?
সস্ মিক্সের আসল স্বাদে
অথেনটিক রামেন মানেই
চপস্টিক রামেন!
চপস্টিক
রামেন
সস্ মিক্স আর সিজনিংয়ের
অথেনটিক কম্বিনিশনে
1st EVER
AUTHENTIC
RAMEN
OF BANGLADESH
বিস্তারিত
জানতে
স্ক্যান
করুন
Chopstick
RAMEN
HOT CHICKEN
Chopstick
RAMEN
HOT CHEESE
স্কয়ার
ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ

রুচি

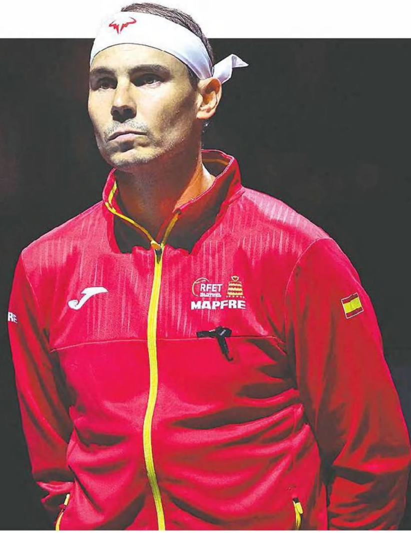

বিদায় লাল দুর্গের রাজা

মৃণাল সাহা

অন্ধকারকে প্রচণ্ড ভয় পান রাফায়েল নাদাল। অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎ চমকে উঠলে আঁতকে ওঠেন। পশুপাখিও খুব একটা পছন্দ না। সমুদ্রপারে জন্ম, জাহাজের নাবিক হয়ে বহুদূর পাড়ি দেওয়া তাঁর স্বপ্ন। অথচ একটু গভীর পানি হলেই সাঁতরাতে বুক দুরুদুরু করে তাঁর। মোটরসাইকেল কিনেছেন, কিন্তু চড়তে গেলে মনে হয়, থাক না। একবার এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, ছোটবেলায় কখনো মারামারি করেছেন? নাদাল আঁতকে উঠে উত্তর দিয়েছিলেন, কখনো না। ছোটবেলায় মারামারি দেখলেই দূরে সরে আসতেন তিনি।

অথচ নাদালের সব ভয় উবে যায় কোর্টে পা দিতেই। জীবনের প্রতি পদে ভীতসন্ত্রস্ত নাদাল হয়ে ওঠেন হিংস্র, পাগলা ষাঁড়ের মতো ছুটে বেড়ান কোর্টের প্রতিটি প্রান্তে। তাঁর রাজত্বে হানা দেওয়ার অধিকার নেই কারও। রজার ফেদেরারের চোখধাঁধানো ফোরহ্যান্ড কিংবা নোভাক জোকোভিচের টপস্পিন-কোর্ট পাড়ি দিয়ে হলেও নাদাল সে শট থামাবেন। কোর্টে খেলা প্রতিটি শটের মূল্য যে তাঁর জীবনের থেকেও বেশি।

আক্ষরিক অর্থেই নাদাল নিজের জীবনের থেকে বেশি ভালোবেসেছেন টেনিসকে। আর কোর্টের মাটি, ঘাস, কার্পেটের চেয়ে থেকে তাঁকে বেশি টেনেছে চোট। নাদালের পেশাদার ক্যারিয়ারের বয়স তখন মাত্র তিন। চোটের কারণে মায়োর্কাতে নিজের বাড়িতেই কাটাচ্ছেন অলস সময়। শোকেসে ঝকঝক করছে নিজের একমাত্র গ্র্যান্ড স্ল্যামটা। এমন সময় মাদ্রিদ ডাক্তারের ফোন, পায়ের পাতার হাড়ে ধরা পড়েছে এক বিরল রোগ। পায়ের পাতার হাড় ঠিকঠাক বৃদ্ধি পায়নি তাঁর। ফলে যখনই পায়ের ওপর বেশি চাপ পড়ে, নাদাল কুঁকড়ে ওঠেন ব্যথায়। এই রোগের নেই কোনো চিকিৎসা, পায়ের ওপর চাপ যত কম পড়বে, ততই ভালো থাকবেন তিনি। আগবাড়িয়ে নাদালকে ভিন্ন পথও দেখিয়ে দিলেন, 'গলফটা খেলতে পারো। ওতে পায়ের ওপর অত চাপ পড়ে না।'

কোর্টে ফেরা তখন অনিশ্চিত। মাটিতে পা ফেলতেই ব্যথায় কেঁপে ওঠে শরীর। সব ছেড়ে নাদাল ফিরে গেলেন

নিজের বাড়িতে, সমুদ্রের খুব কাছাকাছি। দুঃস্বপ্ন ভুলতে আর কোনো পথ জানা ছিল না তাঁর। কোচ টনি নাদাল হাল ছাড়ার পাত্র নন। ছোট্টবেলা থেকেই সবার চোখের মণি রাফা। পরিবারের প্রথম নাতি বলে কথা, দাদা-চাচাদের প্রথম খেলার সঙ্গী। রাফার হাতে অপশন ছিল দুটোই, হয় বড় চাচার সঙ্গে টেনিস খেলা। নইলে ছোট চাচা মিগুয়েল অ্যাঞ্জেলের সঙ্গে ফুটবল খেলা। মিগুয়েল অ্যাঞ্জেল তখন বার্সার বড় তারকা। পত্রিকায় তাঁর পরিচিতি, মাঠে তাঁর ডাকনাম 'দ্য বিস্ট অব বার্সেলোনা'। মিগুয়েলের সঙ্গে সঙ্গে রাফাও তত দিনে বার্সা ড্রেসিংরুমের বিশাল তারকা।

গোলাকার বল ছেড়ে রাফা খুঁটি গেড়েছিলেন কোর্টে। গোলাকার বল ভালোবেসেছেন, সময়ে-অসময়ে খেলেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভালোবেসেছেন র‍্যাকেটকে। সেই ভালোবাসাকে এত সহজে ছেড়ে যেতে দেবেন টনি? সম্ভব নয়। নাদালকে নিয়ে এলেন কোর্টে। পা চলছে না? না চলুক। কোর্টের মধ্যে একটা চেয়ারে বসিয়ে চলল অনুশীলন। যোগাযোগ করলেন নাইকির সঙ্গে। বিশ্বের সেরা অর্থোপেডিক ডাক্তারদের সাহায্য নিয়ে বানানো হলো বিশেষ জুতো। সেই জুতো পায়ের পাতা থেকে ভর সরিয়ে নিয়ে গেল পায়ের গোড়ালি। বদলে গেল রাফার খেলার ধরণ, কোর্টে নাদাল হয়ে উঠলেন আরও দুরন্ত।

রজার ফেদেরার ততদিনে টেনিস জগতের একচ্ছত্র অধিপতি। শিরোপা জিতছেন রীতিমত ঘোষণা দিয়ে, টেক্কা দেওয়ার নেই কেউ। থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট আর স্লিভলেস টি-শার্টের এক ছেলে হাজির হলেন, রাজত্বে বসিয়ে দিলেন এক হাত। পুরো কোর্ট দাঁপিয়ে বেড়াচ্ছেন, ছুড়ে দিচ্ছেন একের পর এক ফোরহ্যান্ড আর টপস্পিন। ফেদেরারের হাজার কারিকুরিও উবে যাচ্ছে তার সামনে। কী আশ্চর্য! পুরো পৃথিবী জয় করে এসে ফেদেরার কিনা আটকা পরছেন বিশ না পেরোনো এক দস্যি ছেলের কাছে। নাদাল এসেছিলেন 'কিংস্লেয়ার' হয়ে। যেন জানতেন রাজাকে আটকালে রাজত্ব এমনিতেই আসবে। গ্রাস কোর্টে টানা ৫ বছর, ৬৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড থেমে গেল স্প্যানিয়ার্ডের কাছে, সেটাও আবার উইমবল্ডনের ফাইনালে। ক্যারিয়ারের সায়াহ্নে এসেও ফেদেরার ভোলেননি সেই স্মৃতি। নাদাল বরাবরই তার চোখে অমলিন, ভয়ানক আর সেই সঙ্গে এক প্রিয় বন্ধুর নাম।

দুই দশকের ক্যারিয়ারে নাদালের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পেরেছেন একজন, নোভাক জোকোভিচ। কোর্টে সবচেয়ে বেশি দেখা হয়েছে তাঁর বিপক্ষেই। ইতিহাসের সবচেয়ে লম্বা ফাইনাল থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে 'বেগেল', ঘাস-মাটি-কার্পেটের প্রাঙ্গনে রচিত ইতিহাস। কৈশোরে রজার, যৌবনে জোকোভিচ আর শেষে এসে আলকারাজ; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী বদলেছে। বদলেছেন নাদালও। বয়সের সঙ্গে থ্রি কোয়ার্টার ছেড়ে হাফ প্যান্ট পরেছেন, স্লিভলেস ছেড়ে থিতু হয়েছেন টি-শার্টে। যৌবন শেষে হারিয়ে গিয়েছে মাথার লম্বা চুল। হারায়নি শুধু তাঁর উন্মাদনা। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার মানসিকতা।

নাদালকেও একদিন শেষ করতেই হতো। বিশাল আয়োজন বরাবরই অপছন্দ তাঁর। ইচ্ছে ছিল একটাই, কোর্ট থেকে বিদায় বলার। ফ্রেঞ্চ ওপেন চেয়েছিল আয়োজন করতে, অলিম্পিকেও ছিল বন্দোবস্ত। নাদাল খারিজ করে দিয়েছেন বারবার। বিদায়ে তাঁর বড্ড ভয়। এই বন্ধুর পথ একা পাড়ি দেওয়া সম্ভব না। বিদায়ের ঘর হিসেবে বেছে নিলেন নিজের ঘর, সঙ্গী হিসেবে নিজের দল আর মঞ্চ হিসেবে নিজের প্রথম লাইমলাইট ডেভিস কাপ।

ডেভিস কাপের মঞ্চে নাদাল প্রথম এসেছিলেন ২০০০ সালে। ১৩ বছর বয়সী রাফার হাতে তখন শোভা পাচ্ছিল স্পেনের পতাকা। নাদাল ছিলেন স্পেনের পরশপাথর, ছয়টি ডেভিস কাপের প্রতিটিই এসেছে তাঁর সংস্পর্শে। পাঁচবার জিতিয়েছেন মাঠ থেকে, আরেকবার মাঠে ছিলেন পতাকা নিয়ে। স্পেনের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠার প্রথম সিঁড়ি ছিল সেই পতাকা। যে মঞ্চ থেকে নিজের উত্থান, সেই মঞ্চেই শেষ করার সুযোগ কজনের হয়?

নাদাল নিজেও জানতেন, শরীরটা তাঁকে আর টানছে না। কোর্টে নিজেকে যত ঢেলে দিয়েছেন, তত যেন আটকে পড়েছেন এক অদৃশ্য বেড়াজালে। এমনটা আগে কখনো হয়নি। এর আগেও শরীরকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন অনেক দূর। সহ্য করতে না পেরে শরীর ভেঙে পড়েছে, কিন্তু দমে যাননি। তখনই বুঝেছেন, দরজায় কড়া নাড়ছে বিদায়।

সত্যি বলতে, নাদাল তাঁর সবটা দিয়ে রাঙিয়েছেন ২০২২ সালকে। দুই সেটে পিছিয়ে পড়েও হার মানেননি, মেদভেদেভের জেতা শিরোপা ছিনিয়ে এনেছেন নিজের কাছে। পূরণ করেছেন নিজের ডাবল ক্যারিয়ার স্লাম। ফ্রেঞ্চ ওপেনে পাঁচ সেটের ম্যাচ খেলেছেন ফেলিক্সের বিপক্ষে, কোয়ার্টারে জোকোভিচকে হারিয়েছেন টেক্কা দিয়ে। শরীরের একের পর এক পেইনকিলার নিয়েছেন, ইনজেকশন দিয়ে অবশ করে রেখেছেন শরীরের বিভিন্ন অংশ। ১৪ নম্বর ফ্রেঞ্চ ওপেন নিয়ে উদ্‌যাপনও করতে পারেননি, সরাসরি বসে পড়েছেন হুইলচেয়ারে। সগৌরবে ফিরেছেন উইলম্বলডনে, কয়েকবার বিরতি নিয়েও মাঠ ছাড়েননি। কোয়ার্টার ফাইনালে টেইলর ফ্রিটজকে হারিয়েছেন পঞ্চম সেটে গিয়ে। শরীর আর সায় দেয়নি, কোয়ার্টার জিতেই সরাসরি হাসপাতাল, অতঃপর সেমি থেকে ওয়াকওভার। শরীরের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন, জাস্ট ফর 'ওয়ান লাস্ট ড্যান্স'! চোট নিয়েও নাদাল ফিরেছিলেন, ফেদেরারকে বিদায় বলতে, লেভার কাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীকে শেষবারের মতো কোর্টে দেখতে।

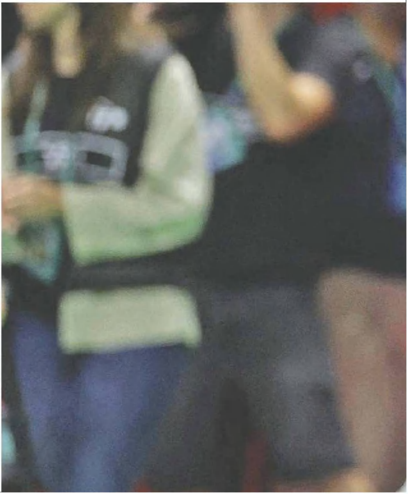

এরপরই বদলে গিয়েছে নাদালের জীবন। ১৪ বছরের প্রেম পূর্ণতা পেয়েছে ২০১৯ সালে। ২০২২-এর অক্টোবরে যুক্ত হয়েছে নতুন সদস্য। রাফার জীবনের এখন সবচেয়ে বড় ভালোবাসার নাম রাফায়েল জুনিয়র। সন্তানের ছোঁয়ায় কতজনই তো বদলে যান, নাদালও হয়তো গিয়েছেন। বছরের পর বছর চোটের সঙ্গে লড়াই করে কোর্টে টিকে থাকা রাফার কোলে যখন ছোট্ট রাফায়েল এল, মুহূর্তেই যেন সব সমীকরণ বদলে গেল। ক্লে কোর্টের লাল মাটি থেকে গ্যালারিতে সন্তানের মুখমণ্ডলটা বেশি প্রিয় হয়ে উঠল।

চাইলে হয়তো নাদাল আরেকবার ফিরে আসার গল্প লিখতে পারতেন। এমন তো না তাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া হয়নি। বিদায়ের ঘণ্টা তাড়া করেছে নাদালকে। সেসবে পাত্তা না দিয়ে তিনি ফিরেছেন বহুগুণ ভয়ানক হয়ে। এবারের শেষের শুরুটা করেছেন নিজেই। শেষটা রাঙিয়েছেন নিজের মনমতো করে। জিততে পারেননি, কিন্তু জিততে নাদাল কখনোই চাননি। তিনি চেয়েছেন জয় করতে।

নাদাল আজীবন পরিচিত হয়ে এসেছেন নিজের হার না মানা মানসিকতার জন্য। পত্রপত্রিকায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে তাঁর রেকর্ড। ক্লে কোর্টের রাজা বললেও যেন অনেক কম বলা হয়ে যায়। মাটির রাজ্যে যে সাম্রাজ্য গড়েছিলেন, তা কলমের কালিতে বোঝানোর সাধ্য নেই কারও। রোলাঁ গারো জিতেছেন ১৪ বার! ১১২ জয়ের বিপরীতে ছিল মাত্র ৪ হার। দুই বছর মাটির কোর্টে ছিলেন অপরাজিত। পাঁচ বছর হারের দেখা পেয়েছেন মাত্র একবার। ২০০৪ থেকে ২০২৩, ১৯ বছরে ক্লে কোর্টে হেরেছেন মাত্র ৩৮ বার। বিপরীতে জয়? ৪৬২! টানা ৯১২ সপ্তাহ ছিলেন র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ১০-এ। কামড় বসিয়েছেন ২২ গ্র্যান্ড স্লাম, ৯২ শিরোপা, ২ অলিম্পিক গোল্ডে। সবটাই অর্জন করেছেন ফেদেরার জোকোভিচের বিপক্ষে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে। নিজের শরীরকে বাজি রেখে।

পরিসংখ্যানের খাতা খুঁড়ে যত গভীরে যাওয়া যাবে, নাদালের রেকর্ডগুলো ততই অবিশ্বাস্য শোনাবে। অথচ নাদাল কখনো সংখ্যা হতে চাননি। ঠাঁই পেতে চাননি খাতায়। নাদাল আজীবনই জায়গা খুঁজেছেন মানুষের মনে। টনি চাচার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনেছেন, তিন বছর বয়সে করা র‍্যাকেট না ভাঙার প্রতিজ্ঞা মেনে চলেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। শিরোপায় কামড় দেওয়া আইকনিক উদ্‌যাপন হয়তো মুছে যাবে, কিন্তু ভালো মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে চাওয়া নাদাল মণিকোঠায় থাকবেন আজীবন।

অদেখা এক মায়ের খোঁজে

প্রান্ত ঘোষ দস্তিদার

আচ্ছা, তোমাদের প্রিয় গল্পকথার ধরন কোনটা? আমার কিন্তু অ্যাডভেঞ্চার গল্প দারুণ লাগে। সেই আগ্রহেই খুঁজে পাওয়া *ওয়ান পিস*-এর মতো দারুণ অ্যানিমে। আবার জাদুমন্ত্রে গাঁথা ফ্যান্টাসি গল্পও বেশ ভালো লাগে। এমন গল্পের প্রতি ভালোবাসা থাকার কারণেই চোখে পড়েছিল ফেইরি টেল অ্যানিমে। অ্যাডভেঞ্চারও *ফেইরি টেল*-এ ছিল বৈকি! আর থাকবে না-ই বা কেন? এই সিরিজের মাঙ্গাকা হিরো মাশিমা যে এ ধরনের গল্প লিখতে সিদ্ধহস্ত, তা আগেই প্রমাণ করে ফেলেছিলেন তাঁর প্রথম প্রকাশিত ধারাবাহিক *রেইভ-মাস্টার*-এর পাতায় পাতায়। *ফেইরি টেল* দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তিনি জিতে নিয়েছিলেন অগণিত ভক্তের মন। আমি অবশ্য *ফেইরি টেল*-এর নিয়মিত ভক্ত ছিলাম না কোনো কালেই; কিন্তু যত দূর দেখেছি, ভালোই লেগেছিল।

তোমরা হয়তো ভাবছ, বলছি ওয়ান পিস আর *ফেইরি টেল*-এর কথা, কিন্তু পোস্টার ভিন্ন অ্যানিমের কেন? তেমন বিশেষ কোনো কারণ নেই। মূলত অ্যাডভেঞ্চার গল্পধারাটি কীভাবে স্মৃতিকাতর করে তোলে, তা-ই বোঝানোর সামান্য চেষ্টা বলতে পারো। আর কারণ যদি কিছু খুঁজতেই চাও, তাহলে বলব, আজ যে সিরিজ সম্পর্কে তোমাদের জানাব, তা 'ফেইরি টেল' গল্পের লেখক হিরো মাশিমারই আরেকটি দারুণ সৃষ্টি।

শুরুতেই জানিয়ে রাখা ভালো যে ইডেনস জিরো সিরিজটি মূলত একটি স্পেস অ্যাডভেঞ্চার। অর্থাৎ মহাকাশ অভিযানের গল্প। এর আগে তোমাদের বলেছিলাম *আস্ত্রা লস্ট ইন স্পেস* অ্যানিমেটি নিয়ে। ওটাও মহাকাশযাত্রার গল্প ছিল, তবে ঘটনাক্রমের বিচারে ইডেনস জিরো একদমই ভিন্ন। মহাকাশের কথা শুনলেই মনে হতে পারে, বিজ্ঞান কল্পকাহিনির প্রেমিক না হলে এ বস্তু হয়তো ভালো লাগবে না। অবশ্য, তোমাদের

অন্তত এই অ্যানিমের ক্ষেত্রে এমন অভিজ্ঞতা হবে না। বিজ্ঞানপ্রেমী না হলেও তোমরা নিছক অভিযানপ্রেম থেকেও উপভোগ করতে পারবে ইডেনস জিরো।

আমি লক্ষ করে দেখেছি, অনেক অ্যানিমেতেই প্রধান চরিত্রের মা-বাবার কোনো উপস্থিতি থাকে না। যদিও তারা বয়সে কিশোর, দেখা যায় যে তাদের মা-বাবা কিংবা অন্য কোনো অভিভাবকের সঙ্গে বসবাস করার প্রয়োজন পড়ে না। আবার অনেক সময় এমনও হয় যে মা-বাবা মৃত। কিংবা তারা আছে ভিনদেশে! কখনো আবার মা-বাবা থাকে, তবে তাদের উপস্থিতি কম। হয়তো পঁচিশ পর্ব পর মা একটু আওয়াজ দিল রান্নাঘর থেকে। কিংবা বাবা প্রথম দুই-তিন পর্বে দেখা দিয়ে আবার ফিরে এল আঠারো পর্ব তফাতে! এ ক্ষেত্রে ইডেনস জিরোর মূল চরিত্র শিকি একেবারেই ব্যতিক্রম নয়। তবে একটা বিশেষ আঙ্গিকে সে অন্যান্য চরিত্রের চেয়ে আলাদা। শিকি বেড়ে উঠেছে এক যন্ত্রমানব সমাজে। বহুকাল আগে তাকে মহাকাশ থেকে এখানে নিয়ে এসেছিল এক যন্ত্রমানব, যাকে ইতিহাস মনে রেখেছে 'ডেমন কিং' নামে। ভয়ানক পরাক্রমশালী সেই যন্ত্রমানব নিজের মহাকাশ অভিযানের মূল লক্ষ্য অপূর্ণ রেখেই শিকিকে নিয়ে ফিরেছিল গ্রানবেল রাজ্যের সেই পরিত্যক্ত শহরে, যেখানে মানুষের যাতায়াত থেমে গেছে বহুকাল আগেই। মানুষবিহীন অঞ্চলে শিকি বেড়ে উঠল যন্ত্রজাতির পরিচর্যায়। সে শিখল বন্ধুত্ব। পুরোটা সময় অবশ্য তার পিতৃতুল্য যন্ত্রমানব ডেমন কিং জিগি তার সঙ্গে রইল না। নিজের আদর্শ বজায় রাখতে জিগি যখন জীবন ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিল, তত দিনে সে তার সন্তানতুল্য শিকিকে শিখিয়ে দিয়েছে মানবিক মূল্যবোধ। আরও শিখিয়েছে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার উপায়। শিকি তার প্রয়োজনমতো নিয়ন্ত্রণ করতে শিখে নেয় মাধ্যাকর্ষণ বল বা গ্র্যাভিটি। পুরো মহাজগতেই এ ধরনের ক্ষমতার বিশেষ গুরুত্ব আছে। একে বলে ইথার গিয়ার।

শিকি স্বপ্ন দেখে, একদিন তার অনেক বন্ধু হবে। সে যাবে বিশ্বজগৎভ্রমণে। খুঁজে পাবে কিংবদন্তি এক মহাজাগতিক সত্তাকে, যাকে সবাই 'মা' বলে ডাকে। এই মা পূরণ করতে পারে অভিযাত্রীর যেকোনো ইচ্ছা। অসীম ক্ষমতা তার। কিন্তু কেউ তাকে দেখেনি, মহাজগতের কোন কোনায় সে থাকে, তা-ও জানে না কেউ।

গ্রানবেল রাজ্যে দিনকাল সুখেই কাটছিল শিকির। একদিন সেখানে হাজির হলো নবীনা বি-কিউবার রেবেকা ব্লুগার্ডেন আর তার সঙ্গী হ্যাপি। বি-কিউব হলো, হালের ইউটিউবার বা টিকটকারদের মতো একপ্রকার ভিডিও নির্মাতা গোষ্ঠী। এদের তৈরি ভিডিও একধরনের ত্রিমাত্রিক কিউবের মধ্যে দেখা যায়। রেবেকার ইচ্ছা, গ্রানবেল রাজ্য নিয়ে একটা বি-কিউব ভিডিও সে সম্প্রচার করবে, যার ফলে বেড়ে যাবে তার জনপ্রিয়তা। শিকির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল অচিরেই। জীবনে প্রথম মানুষের দেখা পেয়ে ছেলেটা আগ্রহী হয়ে উঠল বন্ধুত্ব পাতাতে। ওর সহজ-সরল স্বভাব, রেবেকা তাতে কিছুটা বিরক্ত তো হলোই, আবার আনন্দও পেল।

রেবেকা আসার সঙ্গে সঙ্গে হুট করে বদলে গেল কিছু ব্যাপার। গ্রানবেল রাজ্যের যন্ত্রমানবেরা হঠাৎ বেয়ারা হয়ে উঠল। বিদ্বেষ ও আক্রোশ, যা এত দিন তাদের ভেতর একেবারেই ছিল না, কোত্থেকে যেন আঁকড়ে ধরল তাদের। ফলে রেবেকা আর হ্যাপি পরদিন সকালে নিজেদের আবিষ্কার করল হাত-পা বাঁধা অবস্থায়। একটু পরই আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে তাদের। পরিস্থিতি দেখে বাদ সাধল শিকি। কিন্তু, ওর পুরোনো বন্ধুরা সহসা যেন অচেনা হয়ে গেছে। শিকিকেও আঘাত করে বসল যন্ত্রের দল। পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে বাঁচতে হলে পালাতে হবে রাজ্য থেকে। নিজের শক্তি কাজে লাগিয়ে শিকি সে চেষ্টাই করল। রেবেকা আর হ্যাপিকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছাল রেবেকার মহাকাশযানের কাছে। তারপর ওতে চড়েই ছুটে চলল অন্য গ্রহের পথে।

ইডেনস জিরোর গল্পের শুরুটা এমনই। তবে ওপরে যা বললাম, তাতে প্রায় কিছুই বলা হলো না। সিরিজটা অতি সম্প্রতি দেখতে বসেছিলাম, তারপর দুই বসায় দেখে শেষ করেছি। ঘটনাক্রম এতটাই চমৎকার যে উঠতে পারিনি খুব বেশিবার। পেঁয়াজের খোসার মতো পরতে পরতে বেরিয়ে আসে কাহিনির নতুন আঙ্গিক। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। যেভাবে ভাবিইনি, তেমন কিছুই হঠাৎ করে চলে এসেছে প্রেক্ষাপটে। সত্যি বলতে, এত দিন বসে এত এত অ্যানিমে দেখে ফেলার পর এমন গল্প পেলে বেশ সতেজ লাগে। ওহ, আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো, হ্যাপি নামের একই রকম দেখতে একটি চরিত্র কিন্তু লেখকের এর আগের গল্প 'ফেইরি টেল'-এ রয়েছে, রেবেকার মতো দেখতেও একটি চরিত্র রয়েছে ওতে, তবে ভিন্ন নামে। এ ছাড়া তোমরা 'ফেইরি টেল'-এর প্রধান চরিত্র নাতসুকে এক-দুই সেকেন্ডের জন্য দেখতে পাবে ইডেনস জিরোতে, তবে তার কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই। এ ধরনের উপস্থিতিকে ইংরেজিতে বলে ক্যামিও (Cameo)। তোমরা যারা মারভেল সিনেম্যাটিক ইউনিভার্সের চলচ্চিত্রগুলো দেখে অভ্যস্ত, তারা নিশ্চয়ই সিনেমা জগতের এই চর্চা সম্পর্কে জানো। ওখানকার প্রায় প্রতিটি চলচ্চিত্রেই কমিকস আর্টিস স্ট্যান লি ক্যামিও হিসেবে এসেছেন।

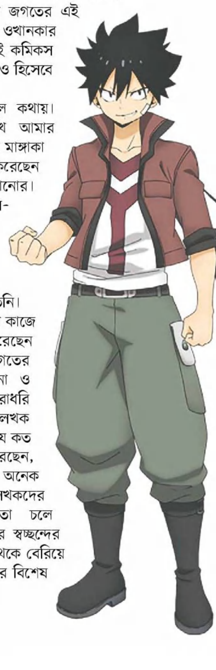

ফিরে আসছি মূল কথায়। ইডেনস জিরো দেখে আমার মনে হয়েছে, এই গল্পে মাঙ্গাকা হিরো মাশিমা চেষ্টা করেছেন নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানানোর। একেবারে ফ্যান্টাসি-নির্ভর ধারা থেকে বেরিয়ে একটু সায়েন্স ফ্যান্টাসি ধাঁচের কিছু করার জন্য কাজ করেছেন তিনি। নিজের সবটুকু যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছেন আনকোরা এক জগতের রূপরেখা যাতে কল্পনা ও বিজ্ঞান হাতে হাত-ধরাধরি করে চলতে পারে। লেখক হিসেবে এ কাজ করা যে কত কঠিন, তা যাঁরা না করেছেন, তাঁরা জানেন না। অনেক সময় দেখা যায়, লেখকদের একধরনের সীমাবদ্ধতা চলে আসে, তাঁরা নিজেদের স্বচ্ছন্দের পরিবেশ বা গল্পধারা থেকে বেরিয়ে অন্যত্র যাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ

প্রত্যেকের শিকির সঙ্গে এসে জুড়ে যাওয়ার পেছনে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা। এসব ঘটনা কখনো দুঃখ দেয়, কখনো-বা ভাবায়। আরও অসংখ্য চরিত্র আছে, যারা তোমাদের সঙ্গে থাকবে বিভিন্ন সময়ে

আগ্রহ দেখান না। হিরো মাশিমার এই চেষ্টাকে তাই তোমাদের ভালো লাগবে বলেই আমার বিশ্বাস। আর তোমরা যদি তাঁর কোনো কাজ আগে না দেখে বা পড়ে থাকো, তাহলে এই অ্যানিমের মাধ্যমেই আবিষ্কার করে ফেলবে চমৎকার এক গল্পকারকে।

চরিত্রায়ণের দিক থেকেও পিছিয়ে নেই অ্যানিমেটি। প্রথমেই বলতে হয় শিকির কথা। একেবারে সোজা পথের মানুষ সে। যা সঠিক বলে মনে হবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে তা-ই করতে। মানুষের বন্ধু হতে চায় সে, তবে যদি কোনো মানুষ কোনো যন্ত্রের ক্ষতি করে, তাহলেও সে রুখে দাঁড়াবে, প্রয়োজনে লড়বে যন্ত্রদের পক্ষ হয়ে। এ ছাড়া মূল চরিত্রের একজন অবশ্যই রেবেকা। নিজেকে প্রমাণ করার অদ্ভুত এক তাগিদ তার মধ্যে আছে, কিন্তু সে জন্য বাঁকা পথ ধরতে সে রাজি নয়; বরং পরিশ্রম করেই জিতে নিতে চায় পুরস্কার। আর হয়তো সে জন্যই বি-কিউবার দুনিয়ায় সে একেবারেই জনপ্রিয় নয়। এখানে তার ঠিক বিপরীত হিসেবে আরেক বি-কিউবারকে দেখানো হয়েছে। মেয়েটির নাম লাবিলিয়া ক্রিস্টি। খ্যাতির জন্য যতটা নিচে নামা সম্ভব, এই মেয়ে তা নামতে পারে। প্রয়োজনে অপদস্থ করতে পারে সতীর্থদেরও। যদিও এই ধারাবাহিকে লাবিলিয়াকে বেশ কয়েকবার হাসির জোগান দিতেও দেখা যায়। আছে জিগি, যে প্রথম পর্বে মারা গেলেও গল্পের তাগিদেই একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় না কখনোই। তার মতো দূরদর্শী চরিত্র বোধ হয় এই গল্পে খুব কমই আছে। হ্যাপিও বেশ ভালো সহযোগী। ওয়াইজ স্টেইনার কখনো কখনো বড় সহায়ক, কখনো-বা ভীতু। আছে পিনো, সিস্টার, উইচ, হেরমিট, এলসি; যারা যন্ত্রমানব হলেও তাদের ভেতর আছে আবেগ আর মানবিকতা। এদের প্রত্যেকের শিকির সঙ্গে এসে জুড়ে যাওয়ার পেছনে রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা। এসব ঘটনা কখনো দুঃখ দেয়, কখনো-বা ভাবায়। আরও অসংখ্য চরিত্র আছে, যারা তোমাদের সঙ্গে থাকবে বিভিন্ন সময়ে। দেখিয়ে দেবে সাম্প্রতিক পৃথিবীর নানান চিত্র যা চিরায়তকাল ধরে একইভাবে চলতে পারে মহাজগতের যেকোনো প্রতিষ্ঠিত সমাজে।

হিরো মাশিমা 'ইডেনস জিরো' গল্পটি শুরু করেছিলেন ২০১৮ সালে, আর লেখা শেষ করেছেন ২০২৪ সালে। মোট ২৯৩ অধ্যায়ের গল্পকথা ৩৩টি ভলিউমে প্রকাশ করেছে জাপানের বিখ্যাত প্রকাশনী কোদানশা। এযাবৎকালে দুটি অ্যানিমে সিজনে ২৫টি করে মোট ৫০টি পর্বে রূপান্তরিত হয়েছে দর্শকের জন্য। পুরো কাহিনি এখনো অ্যানিমে মাধ্যমে বলা বাকি, তবে তোমরা শুরুটা অবশ্যই করতে পারবে। জনপ্রিয় অনলাইন সার্ভিস নেটফ্লিক্সে প্রথম সিজনটি তোমরা পেয়ে যাবে অনায়াসেই। তবে দ্বিতীয় সিজনের জন্য খুঁজতে হবে ক্রাঞ্চিরোল স্ট্রিমিং সার্ভিস। এবার দেখার বিষয় হলো, তৃতীয় সিজন কোথায় মুক্তি পায়!

শেষে বলব, ওপরে যা যা বললাম, তা পড়ে সামান্যতম আগ্রহ জেগে থাকলে সিরিজটা একবার পরখ করে দেখো। অনেক জনপ্রিয় সিরিজের ভিড়ে এসব ভালো গল্প হারিয়ে যায়। তোমরা ইন্টারনেট খুললেই দেখবে 'স্পাই এক্স ফ্যামিলি', 'নারুতো', 'জিজুৎসু কাইসেন' ইত্যাদি অ্যানিমের জয়জয়কার, কিন্তু আরও অগণিত চমৎকার সব অ্যানিমে চুপচাপ বসে আছে তোমাদের জন্য। যেসব নিয়ে অত কথা হয় না, অত উল্লাস-হইচই হয় না। আমি নিয়মিত চেষ্টা করি সেসবের কয়েকটা হলেও অন্তত তোমাদের জন্য আবিষ্কার করতে। তা থেকে তোমরা যদি সামান্যতম আনন্দও পাও, তবেই আমার কাজ সার্থক। আরও একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি, অনেকটা ইচ্ছা করেই গল্পের মূল আকর্ষণীয় ঘটনাক্রমগুলো সম্পর্কে তোমাদের প্রায় কিছুই বলিনি। কারণ, যে আবিষ্কারের মজা আমি পেয়েছি, তোমরাও যেন তা থেকে বঞ্চিত না হও। দেখা যাক, তোমাদের ঠিক কতটা ভালো লাগে মহাজাগতিক মায়ের খোঁজে শিকির এই মহাকাশ অভিযান।

App For ATM Card Based Payment Service

প্লে স্টোর/ অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড
করতে টাইপ করুন Qpay Bangladesh

রূপালী ব্যাংক পিএলসি
RUPALI BANK PLC

Qpay

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

সুবিধা সমূহঃ

- **ফান্ড ট্রান্সফার (IBFT)**
  অন্য ব্যাংকে তাৎক্ষনিক ফান্ড ট্রান্সফার।
- **মোবাইল টপ-আপ**
  যেকোনো মোবাইল অপারেটরে রিচার্জ যে কোন সময়।
- **ওয়ালেট ট্রান্সফার**
  মোবাইল ওয়ালেটে ফান্ড ট্রান্সফার।
- **QR পেমেন্ট**
  বাংলা QR কোড স্ক্যান করে মার্চেন্ট পেমেন্ট।
- **ক্যাশ বাই কোড**
  যে কোন Q-Cash নেটওয়ার্কের ATM থেকে কার্ডলেস টাকা উত্তোলন।
- **বিল পেমেন্ট**
  DESCO, DPDC, ওয়াসা, গ্যাস, আকাশ ডিটিএইচ ইত্যাদি ইউটিলিটি বিল পরিশোধের সুবিধা ।
- **ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট**
  Q-Cash সদস্যভুক্ত ব্যাংকের জন্য তাৎক্ষনিক ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট।
- **স্টেটমেন্ট**
  ATM কার্ডের স্টেটমেন্ট দেখার সুবিধা।

RUPALI BANK PLC.
Assures Better Service

রুচি
এটা যে সময়ই হোক, আমার এখন একটা কাজই করার আছে।
তার আগে…
জাদুশিলা রহস্য
পর্ব : ৫
গল্প ও পেনসিল : মেহেদী হক
ইংক ও রং : ঐশিক জাওয়াদ
জায়গাটা কোথায়? বোঝার উপায় নেই। অনেক মানুষ। কথা শুনতে হবে।
ধীরা ঝামেলাটা না করলেই…
হুম, ভবিষ্যৎ। কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যে সময়ই হোক।
আঁধারকুণ্ডের পূজারি অবশ্যই থাকবে। খুঁজে পেতে অনেক সময় লেগে যাবে…সময়…সেই সময়টাই নেই।

রুচি
চানাচুর
ঝাল
এতই ঝাল যে
পুরাই আগুন
রুচি
চানাচুর
ঝাল

বলো কী! কেজি ৭০ টাকা? গত সপ্তাহে না ৫০ টাকায় কিনলাম?
আরে স্যার, সেগুলো তো ছোট আছিল। এডি ভালো হইব, নিয়া যান।
সপ্তাহে সপ্তাহে বাড়াইলেই হবে? দেশে একটা নিয়ম নেই নাকি?
আঁধারকুণ্ড কোন দিকে?
আরে, মাফ করো।
আঁধারকুণ্ড কোন দিকে?
আরে যন্ত্রনা, এই ফকির দেখি আবার শুদ্ধ ভাষায় ভিক্ষা চায়, বললাম না-
...আআআ একি? সন্ত্রাস? গুন্ডা! বাঁচাও!
বল, আঁধারকুণ্ড কোথায়? আমার হাতে সময় নেই।
বিশ্বাস কর, গ্যাঁগ্লাইয়া... দানি না!
বাবাগো! দানো আইছে।

কিসের আওয়াজ?
নিশ্চয়ই কেউ ঝুরিভাজা খাচ্ছে!
রুচি
রুচি ঝুরিভাজা
দারুণ কুড়মুড়ে! দারুণ মচমচে!

কালসংহারী?
কে? কে তুই?
আপনি এসেছেন? সত্যি এসেছেন?
হে মহান 'কালসংহারী'! আমরা তো আপনার জন্যই বসে আছি।
কে তুই? আমার জন্য বসে আছিস মানে?
হ্যাঁ মহান...এ রকমই তো লেখা আছে আমাদের মহান ভূর্জপত্রে।
এসব বাদ দিয়ে আমাকে আঁধারকুণ্ডের পথ জানিস কি না, তাই বল।
অবশ্যই মহান।
জানি বটে, তবে একটা ছোট 'কিন্তু' আছে।
একি? এই গাধাটা কোত্থেকে এল?
আরে, লিয়া। কী খবর? এখানে কী করছ?
আরে রিহাল। এই তো, কিছু করি না, তুমি এখানে কী করো?

কোন্‌টা ছেড়ে
কোন্‌টা খাবো?
রুচি
পটেটো ক্র্যাকার্স

আহ্, প্রায় চলে এসেছি। শীলাখণ্ড তা-ই বলছে। কিন্তু ঠিক কোথায় এই আঁধারকুণ্ড, কীভাবে বুঝব?
আরে! এই ঢিবিটা? এটা ঠিক শীলাখণ্ডের সেই চিহ্ন না?
তা-ই হবে। কিন্তু ঢোকার রাস্তা কোন দিকে? আর কীভাবেই-বা...
গো-রা-হ্-ম্
চলবে

RUCHI EXPLORE LIMITLESS
চলো অজানার পথে
মনোমুগ্ধকর স্থানসমূহের ছবি, ভিডিও, ভ্রমণ অভিজ্ঞতা আর প্রয়োজনীয় টিপস জানতে স্ক্যান অথবা ভিজিট করুন-
www.ruchiexplorelimitless.com
স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিঃ
রুচি

অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু পর্ব : ৪৭

লেখা : আদনান মুকিত
আঁকা : সব্যসাচী চাকমা

উত্তর দাও উপহার নাও

- **কাউকে আটকে রাখা হয়েছে—এটা কার মনে হলো?**
  ক. ইলু খ. বিলু
- **ওদের গাড়ি থামাল কে?**
  ক. পুলিশ খ. ডাকাত

সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে ৩ জনকে দেওয়া হবে উপহার।
উত্তর পাঠানোর ঠিকানা : **অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু**
রিদিশা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড, ৩৬ শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
তেজগাঁও বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২০৮। অথবা,
Email: badsha.rfbl@groupreedisha-bd.com

অ্যাডভেঞ্চার অব ইলু বিলু - গত সংখ্যার বিজয়ী
আফিয়া রাইহানা, ৫ম শ্রেণি, আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিনাজপুর
মো. মিজবাহ উদ্দীন, কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার
নিরব রেজা, ৭ম শ্রেণি, শাহীন স্কুল, মৌলভীবাজার

* শর্ত প্রযোজ্য

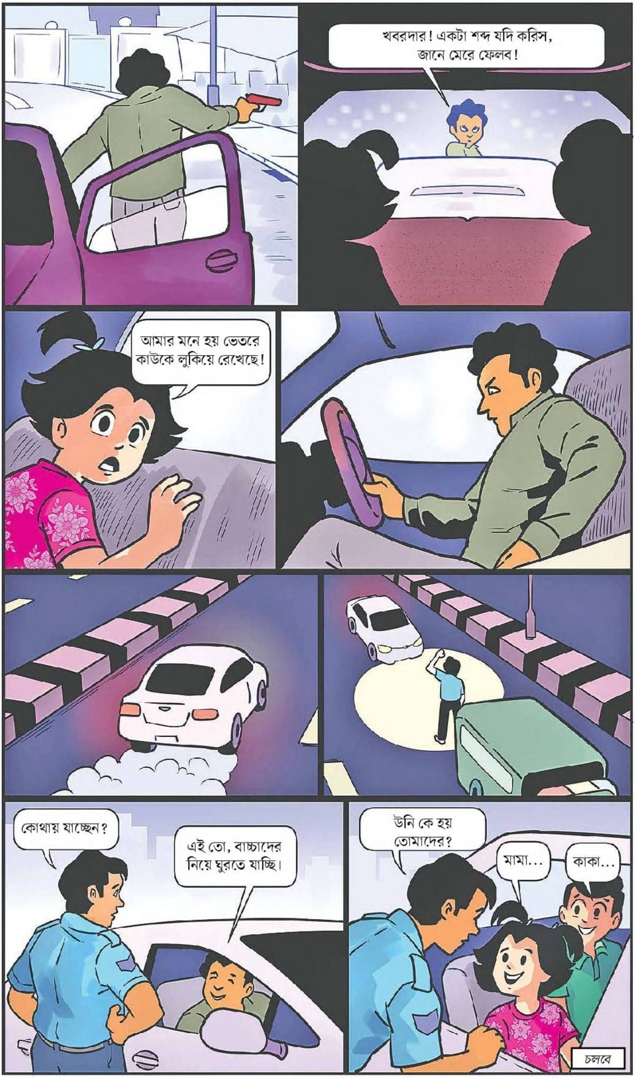
খবরদার! একটা শব্দ যদি করিস, জানে মেরে ফেলব!
আমার মনে হয় ভেতরে কাউকে লুকিয়ে রেখেছে!
কোথায় যাচ্ছেন?
এই তো, বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছি।
উনি কে হয় তোমাদের?
মামা...
কাকা...
চলবে

অধ্যায়-৭

কেমন করে উড়তে হয় না

ফাহিম আনজুম রুম্মান

এই কেসে দুইটা স্যুট ছিল, আমি জানতাম না অন্যটা কার জন্য।
ওয়াও!

বাহ্‌,
কী সুন্দর!

কিন্তু এটার সঙ্গে তো কোনো হেলমেট নেই। সমস্যার সমাধান হলো না!
হুম...
আচ্ছা, আমাকে কয়েক মাস দাও, আমি কিছু একটা বানিয়ে দেব।

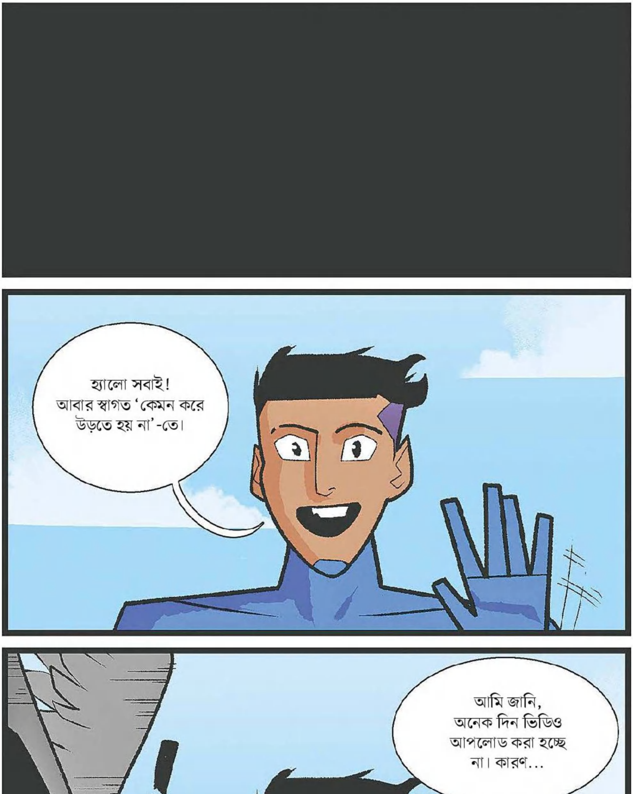
হ্যালো সবাই!
আবার স্বাগত 'কেমন করে উড়তে হয় না'-তে।
আমি জানি, অনেক দিন ভিডিও আপলোড করা হচ্ছে না। কারণ...

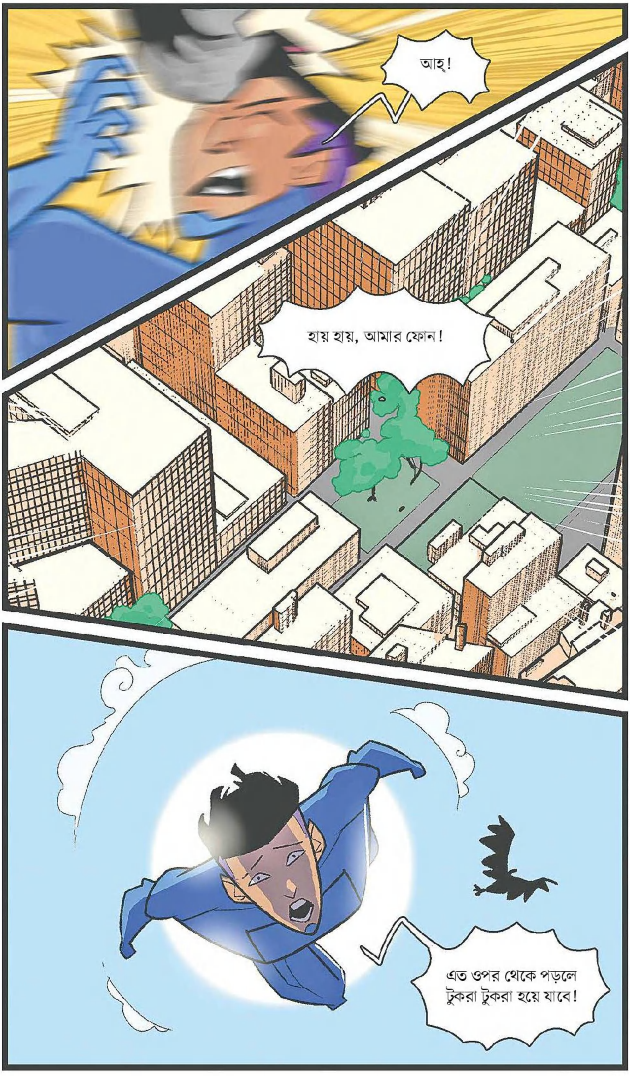
আহ্!
হায় হায়, আমার ফোন!
এত ওপর থেকে পড়লে
টুকরা টুকরা হয়ে যাবে!

হাহা, সারপ্রাইজ!
চলবে...

প্র
প্রকাশন
সাবধান, অন্য এক জগতে প্রবেশ করছো তুমি!

ঘরে বসে বই পেতে www.prothoma.com ০১৭৩০ ০০০৬১৯

মৌলিক কিশোর উপন্যাস

- বাসার স্যারের বাকি রহস্য [২য় মুদ্রণ]—**মাইনুল এইচ সিরাজী**
- প্রতি মঙ্গলবার আমরা বই ছাড়া স্কুলে যাই [২য় মুদ্রণ]—**পলাশ মাহবুব**
- রূপংকর ভয়ংকর [৩য় মুদ্রণ]—**সুমন্ত আসলাম**
- উওজা [২য় মুদ্রণ]—**আশীফ এন্তাজ রবি**
- তিন দুরন্তর শিক্ষাসফর [২য় মুদ্রণ]—**পলাশ মাহবুব**
- পাঁচজন দুষ্টু ছেলে [২য় মুদ্রণ]—**সুমন্ত আসলাম**
- হাফপ্যান্ট [২য় মুদ্রণ]—**ইশতিয়াক আহমেদ**
- মৃথিবী [৪র্থ মুদ্রণ]—**বাদল সৈয়দ**
- লাল বাড়িটা ড্যাঞ্জারাস [২য় মুদ্রণ]—**বিশ্বজিৎ চৌধুরী**

অনুবাদ কিশোর উপন্যাস

- গোরস্তানের গলি। ওয়েলকাম টু ডেড হাউস [৪র্থ মুদ্রণ]—**ডিউক জন** । আর এল স্টাইন
- অদৃশ্য পৃথিবী। মার্কো'স মিলিয়নস [২য় মুদ্রণ]—**তানভীর মৌসুম** । উইলিয়াম স্লিটর
- তুমি রবে নীরবে। দ্য ফল্ট ইন আওয়ার স্টারস [২য় মুদ্রণ]—**মোস্তাক শরীফ** । জন গ্রিন
- মরা মানুষের হাত। অ্যান ইভেন্ট ইন অটাম [২য় মুদ্রণ]—**ডিউক জন** । হেনিং ম্যাঙ্কেল
- খ্যাপাটে শয়তান। দ্য ব্যাড বিগিনিং—**আবুল বাসার** । লেমোনি স্নিকেট
- জলদি পালাও। রেড ডগ [২য় মুদ্রণ]—**তানভীর মৌসুম** । বিল ওয়ালেস
- জ্যান্ত পুতুল আতংক। নাইট অব দ্য লিভিং ডামি [২য় মুদ্রণ]—**মোস্তাক শরীফ** । আর এল স্টাইন

সিরিজ কিশোর উপন্যাস

- পাঁচ গোয়েন্দার তুমুল প্রতিশোধ * ডিটেকটিভ ফাইভ [২য় মুদ্রণ]—**সুমন্ত আসলাম**

আমার সোনার বাংলায়
বই পড়ারও বিকল্প নাই

- ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা, ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৭
- ৪৩-৪৪ আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা, ০১৯৫৫ ৫৫২১৭৬
- শেফ'স টেবিল, ইউনাইটেড সিটি, ঢাকা, ০১৭৩০ ০০০৬০০
- মান্নান মার্কেট, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ০১৭৩০ ০০০৬৪৮
- ইউনিমার্ট বিল্ডিং (নিচতলা), আম্বরখানা পয়েন্ট, সিলেট, ০১৭০৮ ৪৩৫৫৭৯

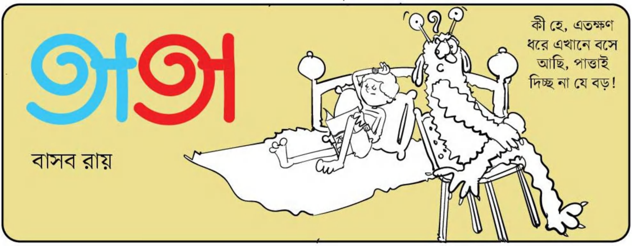
কী হে, এতক্ষণ ধরে এখানে বসে আছি, পাত্তাই দিচ্ছ না যে বড়!

বাসব রায়

দুঃস্বপ্ন!

আহ্ আস্তে, আমি এখন গল্পের চরম জায়গায় এসে পড়েছি। একদম বিরক্ত করা যাবে না আমায়।
!
ইয়াক! কে কে আ-প-নি!
আমি? আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমাদের পরীক্ষা।
হ্যাঁ। আমিই সেই। দেখতে এলাম তোমার প্রস্তুতি কেমন চলছে।
প্রস্তুতি! আমার প্রস্তুতি নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা যে এই রাতদুপুরে বাড়ি চলে এলে!
এসব করে তুমি যে আমায় ভয়ে ভয়ে রাখতে চাও, তা আমি বুঝি না ভেবেছ!
বেশ, তবে শোনো ভালো করে—আমি তোমাকে ভয় পাই না।

প্রশ্নপত্র যত কঠিনই হোক, উত্তরপত্র ভর্তি করাটা পুরোপুরি আমার হাতে। তাই পরীক্ষাটা কোনো ভয়ের ব্যাপারই না আমার কাছে!
আচ্ছা, আমায় না হয় ভয় পাও না, কিন্তু এনাকে? ইনিও যে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।
আমি রেজাল্ট! হা হা হা
ওরে বাবা, রেজাল্ট!
এবার কেমন লাগছে বাছা! হা হা হা
কী ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন!
কী দুঃস্বপ্ন!
কী দুঃস্বপ্ন!
একটা কথা বলব মা?
এসব রেজাল্ট-টেজাল্টের হাঙ্গামা কি খুব জরুরি?
যদি বলো জরুরি, তাহলে সব রেজাল্ট আমরা বড় হয়ে যাওয়ার পর একসঙ্গে প্রকাশ করলে হয় না?

নিউমেরোফোবিয়া
ফোবিয়া মানে নির্দিষ্ট কোনো কিছু নিয়ে ভয় পাওয়া। যদিও সেসব বিষয় নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। গণিত বা সংখ্যা নিয়ে ভয় পাওয়াকে বলে নিউমেরোফোবিয়া। সবচেয়ে ভয়ংকর সংখ্যা ৪ ও ১৩। চীন ও জাপানে ১৩ সংখ্যাটিকে মানুষ বেশি ভয় পায়। এর একটা নামও দেওয়া হয়েছে, ট্রিসকাইডেকাফোবিয়া। যদিও সব সংখ্যাকে কেউ ভয় পায় না, তবে কিছু সংখ্যা ব্যবহার করতে অনেকে ভয় পায়।

ডিসক্যালকুলিয়া
৭৬ ও ৪৬ সংখ্যার মধ্যে কোনটি বড়? এক সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর দিতে না পারলে তুমি ডিসক্যালকুলিয়ায় ভুগতে পারো। অনেকের মস্তিষ্কের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল সংখ্যা তুলনা করতে পারে না। একে বলে ডিসক্যালকুলিয়া। এতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা সময় বলতেও অনেক দেরি করে। তবে এটা খুব বিরল রোগ। স্কুলে দেরি করে গিয়ে ডিসক্যালকুলিয়ায় আক্রান্ত বললে কিন্তু মাফ পাবে না!

যত সমস্যা সংখ্যা নিয়ে

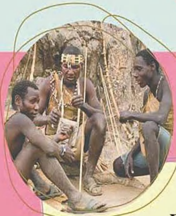

গণিতবিহীন জীবন
সব শিশুই সংখ্যার অনুভূতি নিয়ে জন্মায়। তবু আরও জটিল ধারণাগুলো তাদের শেখাতে হয়। বেশির ভাগ সমাজই গণিতের এই সাধারণ ধারণাগুলো শিশুদের শেখায় এবং নিজেদের জীবনে ব্যবহার করে। তবে সবাই এ নিয়ম মানে না। তানজানিয়ার হাদজা উপজাতির কোনো গাণিতিক জ্ঞান নেই বললেই চলে। কেউ কেউ সর্বোচ্চ ৩ বা ৪ পর্যন্ত সংখ্যা জানে। তা-ও দু-চারজন মাত্র।

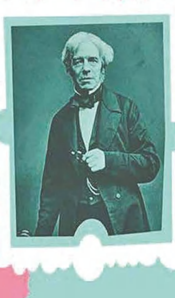

যিনি গণিত শিখেছিলেন দেরিতে
প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার চেয়ে অল্প বয়সে গণিত শেখা অনেক সহজ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে ছোটবেলায় গণিত শেখেননি। ফলে তিনি তাঁর অনেক উন্নতমানের কাজ প্রমাণ বা শেষ করতে পারেননি। গণিতে তাঁর ভালো দখলও ছিল না।

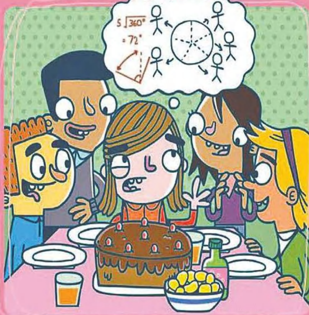

চাক্ষুষ গণিত

অনেক সময় গণিতে অপরিচিত শব্দ বা চিহ্ন ব্যবহারের কারণে কঠিন লাগে। কিন্তু কোনো ছবি আঁকা থাকলে আমরা সহজে বুঝতে পারি। তাই গণিতে ছবি ব্যবহার করে গণিতের ভীতি দূর করা যেতে পারে। অনেকে আবার ভাবতে পারো, আমি তো আঁকতে পারি না, এখন উপায়? তোমাকে খুব ভালোভাবে আঁকতে হবে না। শুধু দাগ দিয়ে স্কেচের মতো এঁকে নিলেই হবে। এতে গণিত বুঝতে সুবিধা হয়।

অনুশীলনই সাফল্যের চাবি

টিভিতে বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন কোনো ভিডিও দেখেছ, যেখানে শিক্ষার্থীরা টপাটপ গণিতের উত্তর দিতে পারে। হিসাব করতে পারে চোখের নিমেষে। আমাদের মধ্যে যাদের গণিতের ভীতি আছে, তারা ওদের অনেক জিনিয়াস মনে করি। আসলে তুমি চাইলেও ও রকম জিনিয়াস হতে পারো। সে জন্য শুধু তিনটি গোপন মন্ত্র জানতে হবে। অনুশীলন, শর্টকাট শেখা ও প্রাথমিক কিছু গণনা মুখস্থ করা।

অনেকে মনে করে গণিত জটিল, সহজে বোঝা যায় না। তাই বেশির ভাগ মানুষ গণিত এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। এটা সত্যি যে কিছু মানুষ সহজে গণিত শিখতে পারে না। কারণ, তাদের শেখার পদ্ধতিতে সমস্যা আছে। তবে এমন মানুষও খুব বেশি নয়। একটু সময় নিয়ে নিয়মিত অনুশীলন করলে গণিত সহজে শেখা যায়। একবার গণিতের ভীতি কেটে গেলে আর গণিত এড়িয়ে চলতে হবে না।

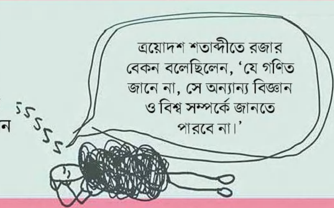

হাউ টু বি আ ম্যাথ জিনিয়াস অবলম্বনে **কাজী আকাশ**

রকমারি.com

প্রিয় বন্ধুরা,

সবাই ভালো আছো আশা করি। দেখতে দেখতে বছরটি শেষ হয়ে এলো; এসে গেলো ডিসেম্বর। ডিসেম্বর মানেই বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। পরীক্ষা শেষ মানেই ছুটি, বেড়ানো, পছন্দের সব বই পড়া-কত্ত কত্ত মজা। কেউ কেউ আবার শখের কাজগুলো নিয়ে বসে। বাগান করা, আঁকাআঁকি কিংবা ক্রাফটিং। শখ কিংবা প্রয়োজন- রকমারি থেকে সংগ্রহ করতে পারো বইসহ অন্যান্য সকল পণ্য।

এ বছরকারের মত পাঠ্যবই পড়ার চাপ তো শেষ, এবার কিছু ফিকশন বই পড়া চলুক। চলো দেখে নিই
গত মাসের রকমারির **বেস্ট সেলার কিছু কিশোর উপন্যাসের তালিকা-**

বুক আইডি	বই- লেখক	মুদ্রিত মূল্য
৩৪৬৩৪৬	**মিসমিদের কবচ** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬০
১৩০৬	**বোতল ভূত**- হুমায়ূন আহমেদ	১৫০
১২০৯	**পিপলী বেগম**- হুমায়ূন আহমেদ	১৪০
৩৩০৭৬	**দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি**- আর্নেস্ট হেমিংওয়ে	১৮০
১৩০৫	**পুতুল**- হুমায়ূন আহমেদ	১৫০
৮৭৫	**তিনি ও সে**- হুমায়ূন আহমেদ	১৩৫
১২০৮	**হিমু মামা**- হুমায়ূন আহমেদ	১৮০
১৩৫৫	**একি কান্ড!**- হুমায়ূন আহমেদ	১৫০
১২৫১০২	**সেরা সাত কিশোর উপন্যাস**- হুমায়ূন আহমেদ	৫০০
১২১৪	**নুহাশ এবং আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ**- হুমায়ূন আহমেদ	১৭৫
১৩৪৮	**ছেলেটা**- হুমায়ূন আহমেদ	১৮০
১২৫২	**সূর্যের দিন**- হুমায়ূন আহমেদ	১৬০
১৪৪৩৫৫	**কিশোর ক্লাসিক লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার এর চারটি বই একত্রে**- কাজী আনোয়ার হোসেন	১৮৩
১১৮৫	**রাক্ষস খোক্কস এবং ভোক্কস**- হুমায়ূন আহমেদ	২৪০
১৭৭২৮৫	**সুন্দরবনে সাত বৎসর**- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮০
৩৮৯৬৭	**আম আঁটির ভেঁপু**- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬০
৮৫৪৮৮	Charlotte's Web- E.B.White	৭৯৮
৬৫৯৪৮	**যকের ধন**- হেমেন্দ্রকুমার রায়	১৮০
১৩৬০০	**রহস্যের দ্বীপ**- রকিব হাসান	২৬০
৬৫৯৫৯	**পিতা ও পুত্র**- ভেরা পানোভা	১৭০
১২৭৫৭৫	**সাত কিশোরের অভিযান**- ইমদাদুল হক মিলন	২০০
২২১৯৪৩	**টাইম মেশিন**- আলী আবদুলাহ	১১৭
২৫২২৬২	**মরণের ডঙ্কা বাজে**- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮০
৭১৬১৩	The Little Prince- Antoine De Saint Exupery	৩৫৮
২০৯১৩৯	**মিসমিদের কবচ**- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮০
২৬১৯০	**একাত্তরের যীশু**- শাহরিয়ার কবির	২০০
৬০৬১৪	**কিশোর উপন্যাস সমগ্র**- হুমায়ূন আহমেদ	৭৫০
৭৩৮৭২	**এ টেল অফ টু সিটিজ**- চার্লস ডিকেন্স	২৩৪
২৭৮	**কুষ্টিয়ায় কিছুক্ষণ**- ফরিদুর রেজা সাগর	৫০
৩২৭৭	**আব্বুকে মনে পড়ে**- হুমায়ুন আজাদ	৩৫০
২৩৩৮৯	**চাঁদের বুড়ির পান্তা ইলিশ**- সেলিনা হোসেন	২০০
৩৭০৪৬	**জলদস্যু**- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (নীললোহিত)	১৭৫
৭৫৮৬৮	**কিশোর উপন্যাস সমগ্র -৪** শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়	১৮০০
৯৩৬০১	**ভয়ংকর দ্বীপে বোকা গোয়েন্দা**- আনিসুল হক	২২০
১৫১২৩৭	**আনন্দ-বেদনার চার বছর**- লরা ইঙ্গল্‌স্ ওয়াইল্ডার	২০০
২৯১০৩১	**এক ডজন কিশোর উপন্যাস সমগ্র**- হুমায়ূন আহমেদ	৭০০
২১২	**ছোটরা যেদিন বাড়ির কর্তা**- আনিসুল হক	২২৫
৭০২৩	**আবার তোরা কিপ্টে হ**- আনিসুল হক	১৪০
৫২৩৬৮	Diary of a Wimpy Kid : Hard Luck- Jeff Kinney	৭৯৮
২০৮৫২১	**অঙ্ক স্যার পাস একদল দুষ্টু ছেলে**- মাইনুল এইচ সিরাজী	২০০
২৭৬	**ময়মনসিংহের ময়না**- ফরিদুর রেজা সাগর	৬০
১৪৩৬৩	**ডেভিড কপারফিল্ড**- চার্লস ডিকেন্স	১২০
৩৪৭৩১	**ঘাতক**- রকিব হাসান	১২০
৩৭১৯৩৫	**আজব দেশে অ্যালিস**- লিউইস ক্যাবল	৮০০
৩৮৭৯০৬	**দাবা**- তারিকুর রহমান	২০০
১৭১০৩	**চারমূর্তি**- নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৬০
৪২৭৫৬	**বুড়ো আংলা**- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮০
৮৪৫৬৭	Diary of a Wimpy kid 6: Cabin fever- Jeff Kinney	৭৯৮
৩৯১৪৩০	**সুন্দরবনে সাত বছর**- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫০
৪২৩১২৩	**দ্য লিটিল প্রিন্স**- আতোয়ান দ্য স্যাৎ একজ্যুপেরি	৩৫০
৭৭	**ফার্স্ট বয় সেকেন্ড বয়**- ইমদাদুল হক মিলন	২৫০
৪২১৭	**হারিয়ে যাওয়ার ঠিকানা**- শাহরিয়ার কবির	২৫০
৪২৯১	**নো বলে রান আউট**- মোস্তফা মামুন	৪৫
৩৪৭৩৬	**শয়তানের ঠিকানা**- রকিব হাসান	১০০
৩৯১৭১	**ব্যাঙ ওস্তাদের জলসায়**- কাজী আবুল কাসেম	৭৫
৪২৯২৬	**জঙ্গল মহলে গোগোল**- সমরেশ বসু (ছদ্মনাম- কালকূট, ভ্রমর)	২৭০
৬০৯৫৪	**একটি প্রায় ভয়ঙ্কর গল্প**- আহসান হাবীব (কার্টুনিস্ট)	১২০
৮৪৫৬৮	Diary Of a Wimpy Kid : The Third Wheel- Jeff Kinng	৭৯৮
৮৫৭৭৮	Charlie and the Chocolate Factory : Penguin- Roald Dahl	৭৯৬
১০৯৬৭৩	**আঙ্কল টমস কেবিন**- হ্যারিয়েট বিচার স্টো	৩৫০

নভেম্বর মাসের 'রকমারি কুইজ' বিজয়ী–

সাজিদ বিন সাঈদ | মো. নানজিব ফাহিম | নুর হাসনাত পরশ | তাহিয়া তাবাসসুম | সাদিয়া আক্তার নিশি

উত্তর: ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। ক ৫। খ ৬। খ ৭। ক ৮। খ ৯। ক ১০। খ

ডিসেম্বরে রকমারিতে আসছে

বর্ষ সেরা অফার ২০২৪

নিয়মিত আপডেট পেতে লাইক দিয়ে রাখো

আপডেট পেতে চোখ রাখো রকমারির ফেসবুক পেইজে।

বইয়ের পাশাপাশি **রকমারি** থেকে সংগ্রহ করতে পার এমন প্রয়োজনীয় কিছু পণ্য দেখে নাও–

* স্টেশনারি–

সাশ্রয়ী মূল্যে এডুকেশনাল ও অফিস স্টেশনারি পণ্য পাবে রকমারিতে।

নোটবুক, খাতা, কাগজ, খাতা, ফাইল, স্ট্যাপলার, জ্যামিতি বক্স, পেনসিল রং সহ অসংখ্য স্টেশনারি আইটেম থেকে বেছে নাও প্রয়োজনীয় পণ্যটি।

* আর্ট এক্সেসরিজ–

রকমারিতে আছে বিশাল আর্ট এক্সেসরিজ। প্যাস্টেল, পেন্সিল রং, জল রং সহ তুলি, ক্যানভাস, ক্লে আরো অনেক কিছু।

1. Mont Marte
2. PAPER TREE
3. Pidilite
4. Faber Castell

* কলম–

রকমারি তে আছে

১. বল পেন
২. জেল পেন
৩. কারেকশন পেন বা ফ্লুইড পেন
৪. স্কেচ পেন

* ক্রাফটিং আইটেম–

রকমারির আর্ট ও ক্রাফটের নানা রকম পণ্য থেকে পছন্দের ক্রাফট আইটেম সংগ্রহ কর আর বানাও তোমার জগত। রকমারিতে আছে–

১. নানা রকম ক্লে, ডো ও স্লাইম
২. ক্রাফটিং কিট
৩. লেগো সেট
৪. ফান বক্স

স্টেশনারী সকল পণ্য দেখতে স্ক্যান কর

কিশোর উপন্যাসগুলো অর্ডার করতে স্ক্যান কর

KIAROK24 প্রোমোকোড ব্যবহার করে বই অর্ডারে বুঝে নাও এক্সট্রা ৫% ছাড়।

রকমারি.com

পণ্য হাতে পেয়ে মূল্য পরিশোধ করুন

যেকোন সমস্যায় হ্যাপি রিটার্ন সুবিধা

যা কিছু দরকারি সাথে আছে রকমারি

মাথা খাটাও

আড়ং ডেইরি
Milk for Good

১. একটি বাগানে ১০০টি ফুলগাছ আছে। প্রতিটি গাছে গড়ে ৭টি ফুল ফোটে। যদি ১৫টি গাছ থেকে ৩টি করে ফুল তুলে নেওয়া হয়, তাহলে বাগানে আর কতটি ফুল থাকবে?

৩. একটি নদী দিয়ে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার বেগে একটি ট্রলার যাচ্ছে। একই নদীর উল্টো দিকে ঘণ্টায় ২০ কিলোমিটার গতিতে বয়ে যাচ্ছে পানি। তাহলে নৌকাটি এক ঘণ্টায় কত দূর যেতে পারবে?

২. স্বপ্নার জন্মদিনে একটা বড় কেক আনা হয়েছে। কেকটা ১২ জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সমানভাবে। প্রত্যেকে কেকের ১/4 অংশ খেয়েছে। তাহলে স্বপ্নার জন্মদিনের সম্পূর্ণ কেক কতজনে খেতে পারবে?

৪. সাহেদের গাড়ি প্রতি ঘণ্টায় ৯০ কিলোমিটার বেগে চলে। গাড়িটি এক ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটার গিয়ে ১০ মিনিটের জন্য থামে। চা খায় রাস্তার পাশের দোকান থেকে। এরপর আবার ৬০ কিলোমিটার বেগে আরও ৩০ মিনিট চলে। এখন বলো তো, গাড়িটি মোট কত দূরত্ব অতিক্রম করল?

গ্রন্থনা : **কিআ প্রতিবেদক**
অলংকরণ : **এআই আর্ট**

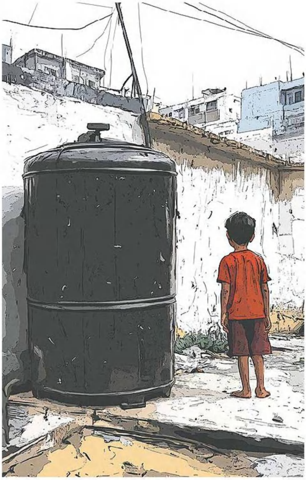

৫. রিমাদের বাড়িতে একটা পানির ট্যাংক আছে। ওটায় মিনিটে ১৫ লিটার পানি ঢোকে। কিন্তু রিমার ছোট ভাই খুব দুষ্টু। ট্যাংকে একটা ফুটো করে রেখেছে। ফলে প্রতি ১০ মিনিটে ওই ফুটো দিয়ে ৫ লিটার পানি বেরিয়ে যায়। এখন হিসাব করে বলো তো, ১ ঘণ্টা পর ট্যাংকে কত লিটার পানি থাকবে?

গতবারের সমাধান

১. আপেল থাকবে ১০টি, কমলা ১৫টি। তাহলে অনুপাত হবে ১০ : ১৫ বা ২ : ৩।

২. ১০ ঘণ্টা

৩. ১৫টি। ৫ দিনে কৃষক খাবেন ৫টি কিন্তু রাখবেন ১০টি, অর্থাৎ ৫টি বেশি থাকবে। আর আগের ছিল ১০টি। তাহলে মোট ১৫টি।

৪. ১৩ কেজি। পানিসহ পাত্রের ওজন ছিল ১০ কেজি। আর ৩ কেজির পাথরসহ হবে মোট ১৩ কেজি।

৫. ৪০ কিলোমিটার

মাথা খাটিয়ে বের করো গণিতের ধাঁধার উত্তরগুলো। তারপর নিচের কুপনটা পূরণ করে পাঠিয়ে দাও কিশোর আলোর ঠিকানায়। খামের ওপর অবশ্যই লিখবে : গণিতের ধাঁধা, কিশোর আলো। সেরা তিনজন বিজয়ীর জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার। কুপনটি পাঠাতে হবে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে। চাইলে কিআর ই-মেইলেও উত্তর পাঠাতে পারো। তাহলে আজই বসে পড়ো গণিতের ধাঁধার সমাধানে।

গণিতের ধাঁধা ৬৫-এর বিজয়ী

- **মিসবাহ উদ্দীন মাছুম**
  কক্সবাজার সরকারি কলেজ, কক্সবাজার
- **রোহিত পোদ্দার**
  মধুখালি পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা
- **সাবাওয়াত নাছির**
  বেগম গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

'গণিতের ধাঁধা ৬৬'-এর উত্তর পাঠাও

নাম ....

বয়স .... শ্রেণি................................ ফোন ....

স্কুল-কলেজ ....

ঠিকানা ....

....

এখানে কাটো

পাঠাবে এই ঠিকানায়
গণিতের ধাঁধা
কিশোর আলো, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ই-মেইল : **editor@kishoralo.com**

আড়ং ডেইরি
Milk for Good

টিনটিনের কুকুর স্নোয়ি

এম এ হান্নান

আজ চলো দুঃসাহসী টিনটিনের গোয়েন্দা সঙ্গী কুকুর স্নোয়িকে বানাই। শুরুতে বাদামি রঙের দুটি বর্গাকার কাগজ নাও।

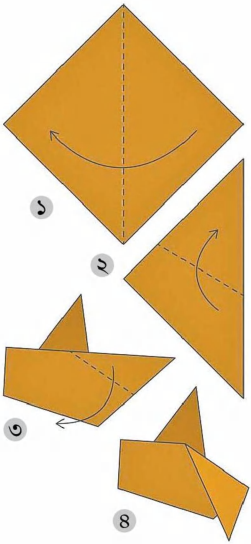

প্রথম অংশ

১। একটি কাগজ নিয়ে তির চিহ্ন বরাবর ডান থেকে বাঁয়ে ভাঁজ করো।

২। নিচের ডট করা অংশটি ওপরের দিকে ভাঁজ করো।

৩। ডট করা ত্রিভুজাকার অংশটি নিচের দিকে ভাঁজ করো।

৪। এটিই হবে স্নোয়ির মাথা।

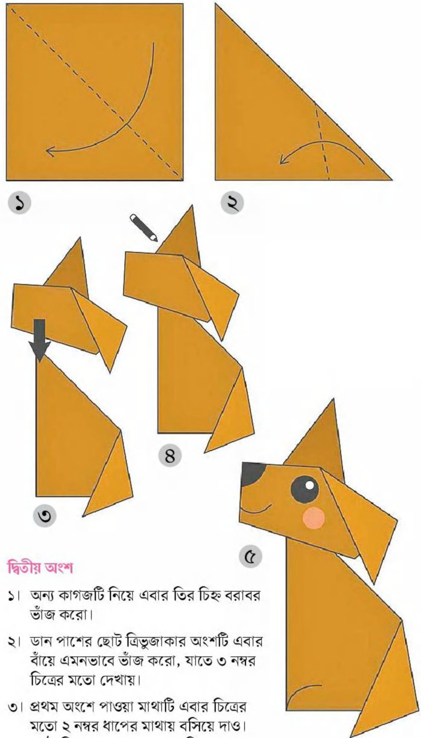

দ্বিতীয় অংশ

১। অন্য কাগজটি নিয়ে এবার তির চিহ্ন বরাবর ভাঁজ করো।

২। ডান পাশের ছোট ত্রিভুজাকার অংশটি এবার বাঁয়ে এমনভাবে ভাঁজ করো, যাতে ৩ নম্বর চিত্রের মতো দেখায়।

৩। প্রথম অংশে পাওয়া মাথাটি এবার চিত্রের মতো ২ নম্বর ধাপের মাথায় বসিয়ে দাও। আঠা দিয়ে ভালোভাবে জুড়ে দিতে পারো।

৪। এবার চোখ-মুখ-নাক, হাত-পা এঁকে নাও।

৫। দেখো তো কেমন সজাগ দৃষ্টিতে কান খাড়া করে বসে আছে কুকুরছানাটি। তোমার কোনো রহস্যের সমাধান খুঁজতে এবার সঙ্গে রাখতেই পারো ওকে। কী বলো!

টুকরো মেলাও ৩৯

নিচের অলংকরণটির যে অংশগুলো নেই, সেগুলো মেলানোর চেষ্টা করো।

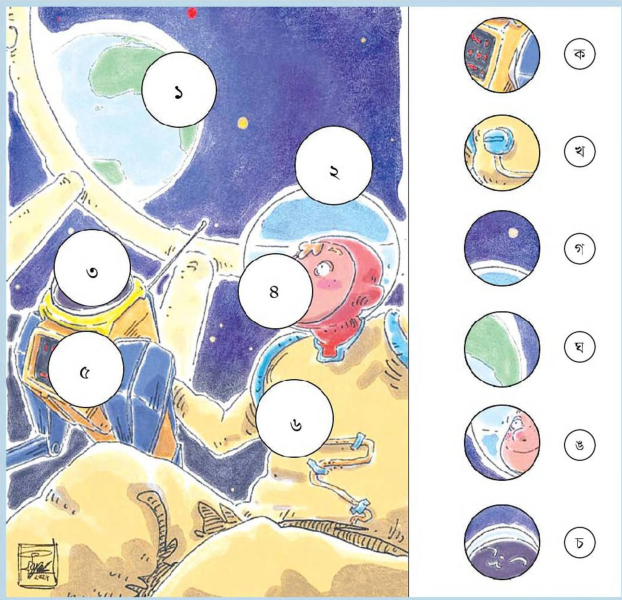

কাকুরো ৩৯

এখানে সাদা খালি অংশে তোমাকে এমন অঙ্ক বসাতে হবে, যেগুলোর লম্বালম্বি কিংবা পাশাপাশি যোগফল হবে ধূসর ঘরে থাকা সংখ্যার সমান। এ ক্ষেত্রে ধূসর ঘরের দাগের ওপরে সংখ্যা থাকলে তা হবে ডানের অঙ্কগুলোর যোগফল। আবার ধূসর ঘরের দাগের নিচে সংখ্যা থাকলে তা হবে নিচের অঙ্কগুলোর যোগফল। লম্বালম্বি কিংবা পাশাপাশি ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো একবারই বসানো যাবে।

	৭	১৬	২৭	
২৩				১৩
২৩				
		১১		
		৬		

কে ভিন্ন ৩৯

চারটি ভাষার অক্ষর দেওয়া আছে এখানে। বলো তো, এগুলোর মধ্যে কোনটি ভিন্ন এবং কেন?

日本語 বাংলা Español 中文

ছায়াছবির ছায়া চেনা ৩৯

নিচের ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ করো। পাশের কোন ছায়াটি ছবির সঙ্গে মেলে?

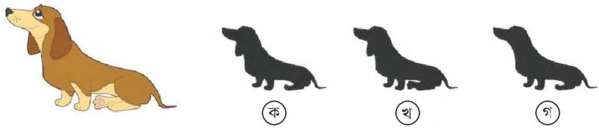

খেলাধুলা জিজ্ঞাসা ৬০

১. আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বনিম্ন স্কোরের রেকর্ড কোন দলের?
ক. ওমান
খ. নাইজেরিয়া
গ. আইভরিকোস্ট

২. আইপিএলের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় কে?
ক. বৈভব সূর্যবংশী
খ. আল্লাহ গজনফর
গ. প্রিয়াংশ আর্য

৩. ২০২৪ ব্যালন ডি'অরে সেরা খেলোয়াড়ের (পুরুষ) পুরস্কার জিতেছেন কে?
ক. রদ্রি
খ. ভিনিসিয়ুস জুনিয়র
গ. দানি কারভাহাল

খেলাধুলা জিজ্ঞাসা ৫৯-এর উত্তর

১. ক. অ্যামেলিয়া কার
২. গ. রাফায়েল নাদাল
৩. ক. বার্সালোনা

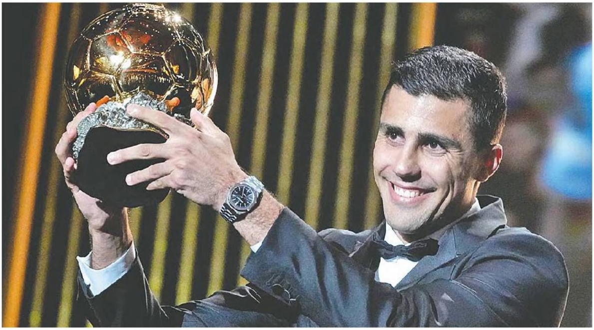

ছায়াছবির ছায়া চেনা ৩৮-এর উত্তর

কে ভিন্ন ৩৮-এর উত্তর

সুডোকু ৭০

৮			১		৬	৫	৩	
৩			৭		৮	৯		৬
						৮		
	৬	৫			৭	১		
৪	৮		৫		২		৬	৯
		৩	৮			৪	৭	
		৪						
৬		২	৯		১			৪
	৭	৮	৬		৪			১

নিয়মাবলি

ছকটি খাতায় এঁকে খালি ঘরে সংখ্যাগুলো বসিয়ে পাঠাও।

সংখ্যার পিরামিড ৩৯

ফাঁকা ঘরে এমনভাবে সংখ্যা বসাও, যেন নিচের দুই ছকে থাকা সংখ্যার যোগফল হয় ওপরের সংখ্যা।

	১৭৯		
		৪৯	

সংখ্যার পিরামিড ৩৮-এর উত্তর

৩৬০			
১৭৪	১৮৬		
৭৮	৯৬	৯০	
৩৬	৪২	৫৪	৩৬

কাকুরো ৩৮-এর উত্তর

		১৪	২৮	১৩
	১০ / ৬	১	৫	৪
২৪	৫	২	৮	৯
১০	১	৩	৬	
	১৭	৮	৯	

কুইজের উত্তর পাঠাও

কুইজের উত্তর চাইলে সব একসঙ্গে পাঠাতে পারো। অথবা তুমি যেগুলোর উত্তর পারো, সেগুলো আলাদা করে আলাদা কাগজেও লিখে পাঠাতে পারো। আগে কাগজে বড় করে কুইজের নাম লিখে পরে উত্তর এবং নিজের পূর্ণ নাম, ঠিকানা, মুঠোফোন নম্বর লিখতে হবে। এই কুপনটি পুরণ করে কেটে পাঠাতে হবে তোমার লেখা উত্তরের সঙ্গে। কুপনের ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। খামের ওপর প্রথমে বড় করে লিখতে হবে 'কুইজ', তারপর পাঠিয়ে দিতে হবে নিচের ঠিকানায়। প্রতিটি বিভাগে তিনজন করে কুইজ বিজয়ীর প্রত্যেকে পাবে রকমারি-এর সৌজন্যে ২০০ টাকার বই। **কুইজের উত্তর পাঠানোর শেষ তারিখ ২০ ডিসেম্বর**। ই-মেইলে পাঠানো উত্তর গ্রহণযোগ্য নয়।

নাম ....

শ্রেণি..

ফোন ....

স্কুল-কলেজ ....

....

পূর্ণ ঠিকানা ....

....

....

....

এখানে কাটো

পাঠাবে এই ঠিকানায়

কুইজ

কিশোর আলো

১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

সুডোকু ৬৯-এর উত্তর

৫	৬	১	৯	৭	৪	৩	৮	২
৮	২	৯	৬	৩	৫	৭	৪	১
৩	৪	৭	২	৮	১	৫	৬	৯
৪	৩	৫	৭	২	৬	১	৯	৮
৭	১	৮	৩	৪	৯	৬	২	৫
৬	৯	২	৫	১	৮	৪	৭	৩
৯	৭	৩	৪	৫	২	৮	১	৬
১	৫	৬	৮	৯	৭	২	৩	৪
২	৮	৪	১	৬	৩	৯	৫	৭

কিআ কিশোর আলো

নভেম্বর সংখ্যার

কুইজ বিজয়ী

তোমাদের পাঠানো অনেক উত্তরের মধ্য থেকে লটারিতে এই ২৪ জনের নাম উঠে এসেছে। তোমরা প্রত্যেকে পাবে রকমারি-র সৌজন্যে ২০০ টাকার বই।

টুকরো মেলাও
- **তানজোয়া তাবানুন**, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, চট্টগ্রাম
- **মো. আরাফাত রহমান**, নাছিমা কাদির মোল্লা হাইস্কুল অ্যান্ড হোমস, নরসিংদী
- **মো. মিরাজুল ইসলাম**, এস কে মডেল স্কুল, নাটোর

কাকুরো
- **ইরফান চৌধুরী**, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- **মো. সালমান হোসেন**, মোহাম্মদপুর কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা
- **মো. তারিকুল ইসলাম খান**, দারুন্নাজাত সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা

কে ভিন্ন
- **ত্বাবীন ইসলাম**, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা
- **মো. ফাহাদ আলম**, কুমিল্লা হাইস্কুল, কুমিল্লা
- **অর্ণব মণ্ডল**, তালা ব্রজেন-দে সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, সাতক্ষীরা

ছায়াছবির ছায়া চেনা
- **সিয়াম সাফিন**, সেন্ট যোসেফ স্কুল, চট্টগ্রাম
- **ফাইরুজ মালিহা**, যশোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, যশোর
- **আবরার হাসান**, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

খেলাধুলার জিজ্ঞাসা
- **মো. রিফাত কোরাইশী**, মসজিদ মিশন একাডেমি, রাজশাহী
- **জ্যোতির্ময় বিশ্বাস**, রাজশাহী বিবি হিন্দু একাডেমি, রাজশাহী
- **জেরিন আহমেদ**, সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা

সুডোকু
- **সামিরা তাসনিম**, নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর
- **তাহসিন মাহমুদ**, নাটোর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, নাটোর
- **নাজমুস সাকিব**, চুয়েট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম

সংখ্যার পিরামিড
- **আনিকা তাহসিন**, হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী
- **স্নেহা নাগ**, সেন্ট স্কলাস্টিকাস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম
- **অমিত দস্তিদার**, সেন্ট মেরিস স্কুল, চট্টগ্রাম

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে
- **জাইয়ান হোসেন**, ইব্রা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা
- **সাজিদ বিন করিম**, দারুল ইরফান একাডেমি, চট্টগ্রাম
- **ফাইজা নূর**, কুমিল্লা মডার্ন স্কুল, কুমিল্লা

গত সংখ্যার উত্তর

টুকরো মেলাও ৩৭-এর উত্তর :

১. চ	২. গ
৩. ক	৪. ঙ
৫. ঘ	৬. খ

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে ১১৫-এর উত্তর :

১. গাইড

২. টেরি প্র্যাচেট

৩. প্রত্যয়ী রায়

১১৬

কিআর মাঝে লুকিয়ে আছে প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে পাঠাও।

১. *বন্দী শিবির থেকে* বইটি কার লেখা?

২. এ বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে কে?

৩. টিনটিনের কুকুরের নাম কী?

কিশোর আলোর

গ্রাহক হও

৬০০ টাকা দিয়ে এক বছরের এবং ৩০০ টাকা দিয়ে ছয় মাসের গ্রাহক হলে কোনো ডেলিভারি চার্জ ছাড়াই ঘরে বসে পেয়ে যাবে কিশোর আলোর পরবর্তী সংখ্যাগুলো।

গ্রাহক হতে ভিজিট করো
https://subscription.palobd.com

অথবা কল করো ০৯৬৬৬-৭০১০৭০ নম্বরে (ছুটির দিন ছাড়া যেকোনো দিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত)

কিআ কিশোর আলো

/reedisha food & beverage limited
Reedisha
Choco Fun
CHOCOLATE
Sandwich Cream Biscuits
NEW
Reedisha Food & Beverage Limited
Reedisha
সবার স্বাদ বোঝে ...

Kishor Alo December 2024, Regd. DA 6257, Year 12, Issue 3, Tk. 50.00